

মধুমালা

কাজী নজরুল ইসলাম

মধুমালা

গীতি-নাট্য

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

ভারতী লাইব্রেরী
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রচনাকাল :
অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ ১৩৬৫

প্রকাশক :
জে. সি. সাহা রায়
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :
গণেশ বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীগণেশপ্রসাদ সরাফ্
মুদ্রক মণ্ডল লিমিটেড
১৭৬, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

পাকিস্তানের পরিবেশক :
নওরোজ কিতাবিস্তান
৪৬, বাংলা বাজার, ঢাকা

দাম ২·০০

মধুমালার গোড়ার কথা

১৯৪৫ সালের কথা—রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চে থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কয়েকজন হ্যারিসন রোডে এ্যাল্‌ফ্রেড্‌ রঙ্গমঞ্চে নাট্যভারতীর উদ্বোধন করি। এখন এই রঙ্গমঞ্চে গ্রেস্‌ সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। নাট্যভারতীর মালিক ছিলেন শ্রীরঘুনাথ মল্লিক ও রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর শ্বশুর স্বর্গীয় গদাধর মল্লিক। গদাধরবাবু একসময়ে আর্ট থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন ও তাঁর নাট্য-প্রীতি ছিল অসাধারণ। তাই গদাধরবাবু ও তাঁর পুত্র শ্রীমান্‌ বিদ্যাধর মল্লিক ও জামাতা শ্রীরঘুনাথ মল্লিক একত্রে যখন একটি খুব ভাল নাটক মঞ্চস্থ করবার সঙ্কল্প করলেন। তখন আমাদের হাতে প্রযোজনা করার মত কোন নাটক ছিল না।

নাট্যভারতীর যিনি নামকরণ করেছিলেন সেই স্বনামখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তখন নতুন নাটক রচনায় ব্যাপৃত কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ভাল নাটক কোথায় পাওয়া যায় তার জন্য অনুসন্ধান চলতে লাগলো।

ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুবর কাজী নজরুল আমায় বললেন যে তাঁর একটি ভাল গীতিনাট্য লেখা আছে সেটি যদি আমি পরিচালনা জন্য গ্রহণ করি, তাহলে তিনি খুশী হবেন।

আমি বললাম, তুমি ভাই, আমায় পাণ্ডুলিপি পড়তে দাও, যদি মনে করি যে তার প্রযোজনা করা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে সম্ভবপর, তাহলে আমরা অবিলম্বে তোমার নাটক নিয়েই কাজ শুরু করবো। নজরুল তার পরদিনই নাটকটি আমার হাতে দিলেন এবং সেই দিনই তা পড়ে আমি গদাধরবাবুকে শোনালাম। তিনিও গীতিনাট্যের রচনা

প্রাণালী দেখে মুগ্ধ হলেন। পরের দিনই বন্ধুবরকে আমি নিয়ে গেলাম তাঁর কাছে এবং মধুমালাকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেল।

কাজী স্বয়ং তাঁর গানের রচনায় সুর সংযোগ করতে এগিয়ে এলেন—তাঁর সুর শুনে গায়ক গায়িকারা মুগ্ধ হল এবং রঙ্গমঞ্চে কর্তৃপক্ষও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

গীতিনাট্যের প্রযোজনা করা বাংলা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে খুবই কঠিন কারণ, সাজ-পোষাক, দৃশ্যপটের চমৎকারিত্ব, সংগীতের বিপুল আয়োজন, সবকিছুর জন্যে যে অর্থব্যয় করা প্রয়োজন অনেক রঙ্গমঞ্চের মালিকের পক্ষে অত টাকা ব্যয় করা সব সময় সাধ্যায়ত্ব হয়ে ওঠে না। তবে গদাধরবাবু ও তাঁর জামাতা রঘুনাথবাবু বললেন যে খরচ করতে আমরা কার্পণ্য করবো না। সত্যি, খরচ করতে তাঁরা পিছপাও হন নি সে সময়। সুপ্রসিদ্ধ রঙ্গশিল্পী মণীন্দ্রনাথ ঘোষ (নানুবাবুকে) মহাশয়কে তাঁরা দৃশ্যপট আলোক নিয়ন্ত্রণের ভার দিলেন, পোষাক-পরিচ্ছদ নতুনভাবে তৈরি করালেন, শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীমতী হরিমতিকে তাঁরা মূল গায়িকা হিসাবে নিযুক্ত করলেন, তাছাড়া সে যুগের নৃত্যগীত কুশলা অভিনয়দক্ষা শ্রীমতী সাবিত্রীকে মধুমালার ভূমিকায় অবতীর্ণ করাতে মনস্থ করলেন। রাজপুত্রের ভূমিকায় শ্রীজহর গাঙ্গুলী ও অন্যান্য ভূমিকায় স্বর্গীয় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষ সিংহ ও আরও কয়েকজন অবতীর্ণ হলেন। গানের ও নেপথ্য সুরের মূর্ছনায়, দৃশ্যপটের অভিনবত্বে মধুমালা অপরূপ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হল।

কাজী স্বয়ং সুরের দিক ও আমি অভিনয়ের দিক দেখতে লাগলাম। সমস্ত দর্শক মুক্তকণ্ঠে মধুমালার প্রশংসা করতে লাগলেন কিন্তু ঐ সময় অপেরার বিপুল ব্যয়ভার গ্রহণ করার জন্য যে দর্শকের সমাগম হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল তা হল না। গীতিনাট্য চিরদিন লোকে অন্য

নাটকের সঙ্গে দেখে এসেছে কিন্তু এককভাবে গীতিনাট্য দেখতে লোকে উৎসাহ বোধ করলে না। অথচ সাধারণ যে-কোন নাটকের দ্বিগুণ পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে এই ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ নাটক রঙ্গমঞ্চে চলে না। এ ছাড়াও সে সময় বর্তমানকালের মত এতখানি রঙ্গমঞ্চের প্রতি প্রীতিও লোকের ছিল না—তাই চল্লিশ রাত্রি অভিনয়ের পর আমাদের আবার অন্য নাটক প্রযোজনা করতে হয়।

তবে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি বিদগ্ধ সমাজ কাজী সাহেবের এই গীতিনাট্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসা ক'রে গেছেন এবং সে সময় সংগীত রসিক ও শিল্পবোধসম্পন্ন দর্শক-মহল অজস্র অভিনন্দন দিয়েছিলেন আমাদের।

মধুমালার কথা পরীদের গান, সংলাপের ভাষা সব কিছু মিলিয়ে—এক মোহময় স্বপ্নাবেশের সূচনা হত প্রেক্ষাগৃহে। কবির রচনা যে সার্থক হয়েছিল তা সকলেই স্বীকার ক'রে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দীর্ঘদিন পরে সেই গীতিনাট্যটি মুদ্রিত ক'রে প্রকাশক রসিক পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্হ হবেন সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। ইতি—

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

৬. ৩. ৫৯

কুশীলব

পুরুষ

মদনকুমার (কাঞ্চননগরের যুবরাজ)
চিত্র সেন (মগদেশের রাজা)
বিচিত্রকুমার (ঐ রাজপুত্র)
দণ্ডধর (কাঞ্চননগরের রাজা)
তাম্বুল (মধুমালার পিতা, সন্দ্বীপের রাজা)
রুদ্রকুমার (সেনাপতি পুত্র, কুমারের বন্ধু)
অয়স্কান্ত (বয়স্য)
ইন্দ্রজিত (ত্রিপুরার রাজা)
ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী, কাঞ্চননগরের প্রধান মন্ত্রী, মগদেশের মন্ত্রী প্রভৃতি।

নারী

মধুমালা (সন্দ্বীপের রাজকুমারী)
কাঞ্চনমালা (ত্রিপুরার রাজকুমারী)
ঘুমপরী
স্বপনপরী
তিলোত্তমা (সন্দ্বীপের রাণী)
পাটেশ্বরী (কাঞ্চননগরের রাণী)
বৃশ্চিকা (মগদেশের রাণী)
রোহিনী (ত্রিপুরার রাণী)

প্রথম অঙ্ক

[হিমালয়ের অঙ্কদেশে বিশাল বনভূমি। চৈতালী চাঁদিনী রাতি। পশ্চাতে বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার বিমণ্ডিত শিরে অর্ধোদিত পূর্ণিমা চাঁদ শশীশেখর দেবাদিদেব শিবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সেই রজত গিরিনিভ বিপুল তনুতে উহা সর্প উপবিতের মত শোভা পাইতেছে। আঁকাবাঁকা বিগলিত তুষারধারা। বর্ষ পরে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে বিরহিণী বনলক্ষ্মী আজ অপরূপ মাধুরীতে শ্রীতে রূপসজ্জা করিয়াছে—যেন তপস্যার শেষে উমা নববধূর বেশে চন্দ্রমৌলি মহাদেবের প্রতীক্ষায় নিশি জাগিতেছেন। বনবিহগের সংগীতে, ভ্রমরের কলগুঞ্জনে, দশদিশি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কমল-দীঘির লাল নীল শ্বেত রক্তকমল কুমুদের মাঝে জোড়ায় জোড়ায় বনহংস-হংসী খেলা করিতেছে। হরিণ ময়ূর নাচিয়া ফিরিতেছে। জ্যোৎস্নার আলোকে বনপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার জাল বুনিয়াছে। দেবদারু পলাশ শাল পিয়াল কৃষ্ণচূড়া কুরুবক "সিলভার-ওক" "রডোডনড্রন" প্রভৃতি তরু গুল্মলতা নানারঙের ফুলের ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই আলোছায়া-সরসীর তীরে নৃত্য-গীত করিতেছে বন-বালিকার দল। সরোবরে পদ্মাসনে বীণা হাতে বসিয়া ঘুমপরী এবং সূক্ষ্ম-মায়াময় জালে আবৃতা হইয়া শ্বেতহংস বাহিনী স্বপনপরী সেই গান শুনিতেছে।

বন-বালিকাদের গান

জাগো বনলক্ষ্মী! জ্যোৎস্না বিহগিত চৈতালী নিশীথে।
রাঙাও দশদিশি লজ্জা-অরুণ রূপ-সজ্জায় বনশ্রীতে॥
তব আলোছায়ার ডুরে শাড়ির আঁচল
লুটাক বকুল-তলে সুখ বিহ্বল,

তব লতা কবরী হের পুষ্প ভারে।
হ'ল অবনমিতা অয়ি অসম্বৃতে ॥
পর গিরি-ঝর্ণার শতনরী হার
হে বনলক্ষ্মী !
বিরহ-শীর্ণা দেহে জাগুক জোয়ার
নব যৌবনের জাগুক জোয়ার
হে বনলক্ষ্মী !
ঝঙ্কৃত হোক বনভূমি নিঝ্ঝুম
পুষ্পিত মাধবীর পর কঙ্কন
আলতা পর কলি পলাশ রঙ্গন
ভ্রমর গুঞ্জন নূপুর গীতে ॥

ঘুমপরী ও স্বপনপরীর গান

হে বিজয়া ! হে না-দেখা রূপের কুমার ! (এস এস)
তন্দ্রা-অলস এই চন্দ্রা নিশির ভাঙো ভাঙো দ্বার ॥

ঘুমপরী ॥
স্বপনকুমারীর খোলো গুণ্ঠন

স্বপনপরী ॥
ঘুম কিশোরীর আনো জাগরণ
দস্যুসম এসে কর লুণ্ঠন
কুণ্ঠিত প্রেম—মধুনিশি গন্ধার ॥

(সহসা অদূরে বিপুল সেনা-বাহিনীর উল্লাস কলরোল ও উদ্দাম সংগীতের দমকা হাওয়া ভাসিয়া আসিল ! ঘুমপরী ও স্বপনপরী

মুদিত কমলের অন্তরালে অন্তর্হিতা হইলেন। বন-বালিকারা বনের তরুলতাকে আশ্রয় করিয়া অদৃশ্যা হইয়া রহিলেন।

শিকারের সজ্জায় সজ্জিত বর্ম-আচ্ছাদিত যুবরাজ মদনকুমার ও তাঁহার সঙ্গী সেনাদলকে দূরে পর্বত শিখরে দেখা গেল—মুদিত কমল হইতে অর্ধ নিষ্ক্রান্তা ঘুমপরী, স্বপনপরী ও অর্ধ লুক্কায়িতা বন বিহারিণীর দল একসঙ্গে গাহিয়া উঠিল—)

সুন্দর! সুন্দর!
অপরূপ! নন্দন—আনন্দ! মনোহর॥
একহাতে মালা তার একহাতে তরবার
শুভ্রপদ্মজ্যোতিঃ ওকি দেবসেনাপতি
ও কি রতির পতি কিশোর মুরলীধর॥

মদনকুমার॥

সুন্দর! সুন্দর! সখা! সেনাপতি! সৈন্যগণ! চন্দ্রদেব অযুত কুমুদিনী লয়ে এই সরোবরে বিহার করছেন। তাঁর এই লীলা সরসীর আনন্দিত তীরে উন্মুক্ত তরবারি অবনমিত ক'রে তাঁকে প্রণাম কর। তাঁর এই মধুর প্রশান্তির মাঝে যেন কোলাহলের আবর্ত এনে পঙ্কিল না ক'রে তুলি।

(প্রথমে যুবরাজ ও পরে সকলে তরবারি নামাইয়া প্রণাম করিল। কেবল বয়স্য অয়স্কান্ত বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।)

এ কি! বয়স্য অয়স্কান্তের মুখে এমন বায়স-কান্তি ফুটে উঠেছে কেন? আরে, এখন ত নির্ভয় হলে এই আনন্দ সরসীর তীরে এসে!

অয়স্কান্ত॥ (হাঁপাইতে হাঁপাইতে)

যুবরাজ! আমাকে এক্ষুণই আমার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিন।

মদনকুমার ॥

স্ত্রীর কাছে ? এখনই ?

অয়স্কান্ত ॥

হ্যাঁ যুবরাজ, এখনই ! আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। আমি অত্যন্ত অপরাধ ক'রে এসেছি সেই দেবীর কাছে (উদ্দেশে প্রণাম) !

মদনকুমার ॥

কি বলছ তুমি বন্ধু ? তুমি পথক্লেশে পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

অয়স্কান্ত ॥

যুবরাজ, পা গোল নয় যুবরাজ, পেট গোল হয়ে উঠছে। দেখছেন না রাজপ্রাসাদের গুম্বুজ—মন্দিরের চূড়ো—হাতীর হাওদা—কামারের হাপর হয়ে উঠল হাঁপানীর বেমোয় ! বাপ ! এর নাম শিকার? তাও যদি কিছু শিকার পাওয়া যেত, শিকার ত হ'ল ছাই, হ'ল শুধু কষ্ট স্বীকার ! চড়াই আর উতরাই, ওঠা আর নামা করতে করতে পেট হয়ে উঠল পটহ !

মদনকুমার ॥

শিকার যে পেলাম না তার জন্য দায়ী তুমি। তোমার জন্য কেউ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে পারিনে। দু'ক্রোশ পথ এসে দেখি, তোমার ঘোড়া গদাইলস্করী চালে ঢিকুতে ঢিকুতে আসছে সবার পিছনে।

অয়স্কান্ত ॥

যুবরাজ ! যে যাই বলুন, ঘোড়া ত ঘোড়া আমার ঘোড়া,

আপনাদের সব ঘোড়াকে আমার ঘোড়া খেদিয়ে নিয়ে যায়। আমার পক্ষীরাজ ঘোড়ার ভয়েই না আপনাদের ঘোড়া এমন ক'রে ছুটতে থাকে। কত কষ্টে আমার ঘোড়াকে থামিয়ে রাখি, বলি, যাক না বাবা, ওরা বড় ভয় পেয়েছে ; ওদের যেতে দে !

রুদ্রকুমার ॥

কিন্তু বয়স্য দা, বৌ ঠাকুরুণের কাছে কেন যেতে চাচ্ছিলেন, তা ত বললেন না ?

অয়স্কান্ত ॥

আরে ভাই, আমি যেদিন শিকারে আসি, তার আগের দিন বৌ-এর সাধভক্ষণ উৎসব ছিল, দোতলায় উঠে আসতে তাঁর অবস্থা দেখে হেসেছিলাম, আজ তোমার বৌঠান এখানে থাকলে হয়ত জিজ্ঞাসা করতেন, হ্যাঁ গো, তোমার সাধভক্ষণ কবে ? (সকলের হাসি)

মদনকুমার ॥

এই তিনদিন ধরে সত্যি সত্যিই শুধু কষ্ট স্বীকারই হ'ল, কোনো শিকার পাওয়া গেল না। যাক, জ্যোৎস্না-ধোওয়া এই অপূর্ব বনশ্রী আর এই কমল-দীঘি দেখে পথের সমস্ত ক্লান্তি আমার জুড়িয়ে গেছে। আজ রাত্রিটা এইখানেই তরুতলে লতা-কুঞ্জের ছায়ায় শুয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক। কি বল সেনাপতি ? সখা অয়স্কান্তের কি মত ?

অয়স্কান্ত ॥

আজ্ঞে, যদি কাছে শ্যাওড়া গাছ না থাকে, আমি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারি। এই তিনদিন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চোখ-মুখ

হয়ে গেছে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতের মত, পেট হয়ে গেছে মাড়োবারের, পা ফুলে হয়ে গেছে উড়িষ্যার, পেটের ভিতর ঝগড়া করছে মাদ্রাজী। আমি একেবারে আন্তর্জাতিক পুরুষ হয়ে পড়েছি! এখন একটু ঘুমুতে না পারলে প্রাণ চলে যাবে চিত্রগুপ্তের দেশে—দেহ নিয়ে টানবে শ্যাওড়া গাছের পেত্নী। (ভয়ে ভয়ে এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিলেন)

রুদ্রকুমার ॥

আচ্ছা বয়স্য দা, পেত্নী নিয়ে যে ঘর করে, তার এত পেত্নীর ভয় কেন? তা ছাড়া তোমার শ্বশুরালয়ও ত পেত্নীতলা গ্রামে আর মামার বাড়ী শেওড়াফুলিতে। কাজেই শেওড়া-গাছ বা পেত্নীকে ত তোমার ভয় করার কথা নয়।

অয়স্কান্ত ॥

তুমি থাম ত হে ছোকরা। তুমি শুধু মানুষ জবাই করতে শিখেছ। মানুষকে পোষ মানানোর গুরুভার কখনো বহন করেছ? বৃষস্কন্ধ পুরুষই নারীকে বয়ে বেড়াতে পারে সংসারে। যুদ্ধে তোমার শোভা যেমন তোমার কোমরের তলোয়ার, তেমনি সংসার-যুদ্ধে পুরুষের শোভা তার কাঁধের স্ত্রী, বুঝেছ?

মদনকুমার ॥

আঃ, এমন রাত্রিটা তোমরা কচকচিতেই কাটিয়ে দিলে! তার চেয়ে কেউ খোঁজ ক'রে দেখতে পার কোথাও দু'চারটে নর্তকী পাওয়া যায় কিনা—যারা তাদের নাচে ও গানে পানসে চাঁদের জ্যোৎস্নাতে ঘন সুরার নেশা ঘনিয়ে তুলবে।

অয়স্কান্ত ॥

এই জঙ্গলে নর্তকী খুঁজতে হলে আকাশে জাল ফেলে দু'চারটে পরী ধরা ছাড়া ত আর উপায় দেখিনে যুবরাজ। এই গভীর অরণ্যের দু'দশ যোজনের মধ্যেও জন-মনিষ্যি আছে বলে ত মনে হয় না। তা অভাবে যখন সবই চলে আমাদেরই বা চলবে না কেন?

মদনকুমার ॥ (হাসিয়া)

অর্থাৎ?

অয়স্কান্ত ॥

অর্থাৎ নর্তকীর বদলে নর্তকার নাচ দেখুন যুবরাজ। সৈনিকগুলো সব এরই মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে আরম্ভ করেছে—ওদের খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলে নাচবার হুকুম দিন।

রুদ্রকুমার ॥

তা মন্দ হবে না যুবরাজ। অন্ততঃ খানিক হুল্লোড় করা যাবে ত! অর্ধেক রাত ত এমনি কাটিয়ে দেওয়া যাক। (ঘুমন্ত সৈনিকদের) এই—এই—সব ওঠো—উঠে পড় সব—বাঘ বাঘ!

(সকলে শশব্যস্তে "এঁ্যা—এঁ্যা—কি বাঘ! বাড়ী কোথায়? বয়েন কত?" ইত্যাদি শব্দ করিয়া বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া জাগিয়া উঠিল)

অয়স্কান্ত ॥

এই আবাগের বেটা ভূত সব! বাঘ নয় বাঘ নয়—ভয় নেই—জাগ্‌ জাগ্‌! তোদের নাচতে হবে!

সকলে ॥

নাচতে হবে ?

সেনাপতি ॥

হ্যাঁ, নাচতে হবে। বাঁচতে যদি চাও সবে, আজ নাচতে হবে !

অয়স্কান্ত ॥

গাইতে হবে, কাশতে হবে, হাঁচতে হবে, গোঁফ দাড়ি সব চাঁচতে হবে !

রুদ্রকুমার ॥

আলবৎ ! নাচতে হবে ! নাচতে হবে !

অয়স্কান্ত ॥

ওরে তোদের ভয় নেই। আমি আগে আগে নাচব, গাইব, ভাব বত্‌লাব, আর তোরাও তারই অনুকরণে গাইবি, নাচবি, ভাবভঙ্গি করবি, বুঝলি ?

মদনকুমার ॥

আচ্ছা। তা হলে আর দেরি নয়, নাচ শুরু হোক।

অয়স্কান্ত ॥ (উষ্ণীষ খুলিয়া উড়ানী করিল—অন্যান্য সকলেও তাহাই করিল—নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া)

আমার নাম পাত্‌লিজান, ওরা গায় ক্ষীণতনু যৌবনভার বইতে নারে, আমি গাইব পাত্‌লি কোমর ভুঁড়ির ভার বইতে নারে ! আচ্ছা, এইবার সব গান ধর্ !

গান

মোদের মর্দানা ঢঙ নাচা মোদের মর্দানা ঢঙ নাচা।
(ওদের) আছে শাড়ির আঁচল মোদের আছে কোঁচা কাছা ॥

ওরা বাঁকায় ভুরু, মারে চোখ, নাড়ে ঘাড়,
আমরা চোমরাই গোঁফ দেখাই বঙ্কিম হাঁটুর হাড়,
ওদের আছে বেণী মোদের আছে দাড়ি
ওরা ঢুলায় মাজা আর আমরা ভুঁড়ি নাড়ি
(ওদের) কণ্ঠ যেন কোকিল মোদের কণ্ঠ হাঁড়িচাঁচা ॥

(হঠাৎ সকলের হাসির হুল্লোড় কমিয়া আসিল, সকলে হাই তুলিয়া তুড়ি দিয়া যেন কোন মায়ার প্রভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। এই নিদ্রা আসিবার পূর্ব হইতেই বেনু বীণা ইত্যাদির ঘুম-আসা অলস স্বর বাজিতেছিল এবং ইহারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইবার সাথে সাথে কমল-দীঘিতে ঘুমপরী ও স্বপনপরী গাহিয়া উঠিল—বন-বালিকারা সাথে সাথে চাপা গলায় গাহিতে লাগিল)

গান

ঘুম আয় ঘুম, ঘুম ঘুম ঘুম।
আকাশ বাতাস জল থল উপবন
সব হোক নিঝ্ঝুম ॥
শান্ত হোক সব অশান্ত কলরোল
রে পথিক! জীবন পথের ক্লান্তি ভোল্
নয়নে লাগুক সুখ-স্বপনের কুঙ্কুম ॥

স্বপনপরী ॥ (মুদ্রিত যুবরাজকে দেখাইয়া)
কি অপরূপ রূপ দেখেছিস। ঘুমপরী?

গান

এরি লাগি তপস্যা কি করে আঁধার রাতি ॥
সই দেখলো চেয়ে রূপ সায়রে জ্বলে এ কোন বাতি
লক্ষ চাঁদের জ্যোৎস্না হেথা কে রেখেছে পাতি?

ঘুমপরী ॥

সত্যিই স্বপনপরী! এই পৃথিবীর পাঁকে এমন নন্দন পারিজাত কেমন ক'রে ফুট্‌ল তাই ভাবছি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

গান

যেন দুধ সাগরের ননী দিয়ে তৈরি লো এর গা
পৃথিবী কি শিউরে ওঠে এ রাখে যখন পা।

স্বপনপরী ॥

তা হলে তুমিও মরেছ?

ঘুমপরী ॥

তুমিও মরেছ মানে, "আমি ত মরেইছি সাথে সাথে তুমিও মরেছ," এই ত?

বন-বালিকাগণ ॥

আমাদের কথা বন-দেবতাই জানেন।

গান

তুমি কে গো (কে কে কে)
তুমি মোদের বন-দেবতা॥
আমরা বনশ্রী—তোমার পূজারিণী ধ্যান-রতা—
হে বন-দেবতা॥

১মা ॥

আমি মালতি মুকুল

২য়া ॥

আমি ব্যাকুলা বকুল

৩য়া, ৪র্থা, ৫মা ॥

মোরা গুণহীনা অশোক পলাশ শিমুল

৬ষ্ঠা ॥

আমি জলের কমল (আঁখি জলের কমল)

৭মা ॥

আমি মাধবীলতা ॥

৮মা ॥

· আমি গিরি মল্লিকা

৯মা ॥

আমি হাস্নুহানা

১০মা ॥

আমি ছোট ভুমো ফুল রই চির অজানা

১১শী ॥

আমি ঝর্ণাধারা কেঁদে কেঁদে বয়ে যাই।

১২শী ॥

আমি দিনের ভাদ্র-বৌ চাঁদের কুমুদ

১৩শী ॥

আমি পাখীর গান বনভূমির কথা ॥

ঘুমপরী ॥

ওলো বনের মেয়ে! তোরা ফুল্ আনতে পারবি—অনেক ফুল চাই—সেই ফুল দিয়ে এই সুন্দরকে সাজাব।

বন-বালিকাগণ ॥

পারব—যত ফুল চাও এনে দিতে পারব—কিন্তু আমাদের সাজাতে দিতে হবে—আমরা নিজ হাতে সাজাব।

স্বপনপরী ॥

আচ্ছা তাই হবে। যা তোরা ফুল আন্!

সকলে ॥ (সোৎসাহে)

চল্ ভাই ফুল আনি—চল্ আমাদের বন-দেবতাকে সাজাব।

(নৃত্যের ভঙ্গীতে একে একে চলিয়া গেল)

ঘুমপরী ॥

ওদের আসার আগেই আমাদের মাঝে একটা রফা হওয়া দরকার। একে কে নেবে, তুমি না আমি?

স্বপনপরী ॥

ছি ছি ঘুমপরী, তুমি কি এই মানব-পুত্রকে ভালবেসে পরীর কূলে কলঙ্ক দেবে? আমি ওকে কখ্‌খনো ভালবাসি নি—বাসব না। মানুষকে আমি ঘৃণা করি, মাটিতে ওদের জন্ম, ওদের বাইরে ভিতরে ধূলার আবর্জনা। তুই যদি চাস ওকে নিতে পারিস। কিন্তু আমি আজই গিয়ে পরীর দেশে রটিয়ে দেবো তোর কলঙ্কের কথা। তুই আর জীবনে পরীদের মাঝে মুখ দেখাতে পারবি নে। ইন্দ্রসভায় নাচতে পারবি নে।

ঘুমপরী ॥

মুখ দেখাতে পারব না কিন্তু এ মুখ ত দেখতে পাব (কতকটা স্বাগতভাবে) কিন্তু পরীর দেশ ত আমার কাছে হবে নিষিদ্ধ। তখন এই পৃথিবীতে—না না, একে মাটির গন্ধ তাতে দিনের আলোক সইতে পারব না। শুকিয়ে যাব, ম'রে যাব। আচ্ছা ভাই স্বপনপরী, এই সুন্দরের পাশে শোভা পায় এমন সুন্দরী তুই দেখেছিস্?

স্বপনপরী ॥

কেন বলত?

॥

আমার প্রয়োজন আছে, যদি তার দেখা পাই তার কাছে রেখে দেখি, কে বেশী সুন্দর। দেখি পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কিনা!

গান

ওলো এক চাঁদকে সৃষ্টি ক'রে বিধির পুঁজি শেষ
এই চাঁদের পাশে চাঁদ শোভা পায় আছে সে কোন্ দেশ!

স্বপনপরী ॥

আমি এমন সুন্দরী দেখেছি যাকে দেখে মনে হবে বিধাতার বলাস-লক্ষ্মী। বিধাতা-পুরুষ তাকে তাঁর মনের সকল মাধুরী দিয়ে রচনা করেছেন!

গান

এতো একা চন্দ্রমণি সে মাণিকের ডালা।
এ সারা বনে একটি কুসুম, সে কুসুমের মালা॥
হাসলে কন্যা ফুটে ওঠে পৃথিবীতে ফুল
সে কাঁদলে পরে ভেঙে পড়ে সাত সাগরের কূল
ইন্দ্রলোকে দেখেনি কেউ তেমন দেব-বালা॥

ঘুমপরী ॥

অসম্ভব! বাতুলের কথা। তা যদি হয় আমি এর ওপর আমার সমস্ত দাবি ছেড়ে দেবো।

স্বপনপরী ॥

সত্যিই?

ঘুমপরী ॥

সত্যি সত্যি তিন সত্যি। এই ফুল ছুঁয়ে শপথ করছি

স্বপনপরী ॥

আমিও চাঁদের দিকে চেয়ে শপথ ক'রে বলছি, সে যদি এর চেয়ে সুন্দর না হয় আমিও এর ওপর সমস্ত দাবি ছেড়ে দেবো।

ঘুমপরী ॥

বেশ, তা হলে চল একে উড়িয়ে নিয়ে যাই সেই দেশে কিন্তু কোথায় সে দেশ ? তার নাম কি ?

স্বপনপরী ॥

এখন বলব না সে দেশের নাম—তারও নাম। সে দেশে পৌঁছে তার পাশে একে রেখে জাগিয়ে দিলেই সব জানতে পারবি। কিন্তু আমি যে পথে যেতে বলব কোনো প্রশ্ন না ক'রে সেই পথে যেতে হবে। কেমন, রাজী ?

ঘুমপরী ॥

রাজী। তা হলে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল, বনের মেয়েরা দেখলে আর ছেড়ে দিতে চাইবে না।

স্বপনপরী ॥

দাঁড়া আমার ময়ূরপঙ্খী বিমানকে স্মরণ করি, সে এলে দু' জনে ওকে তাতে শুইয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাব।

স্বপনপরীর গান

আয় আয় মোর ময়ূর বিমান আকাশ নদী বেয়ে।
ফুল ফোটানো হাওয়ায় ভেসে চাঁদের আলোয় নেয়ে॥

(ময়ূর বিমান মধুর শব্দ করিয়া আসিয়া পৌছিল। ফুলপরীরা কুমারকে সেই বিমানে লইয়া গাহিতে গাহিতে উড়িয়া গেল।)

স্বপনপরীর গান

সোনার খাটে ঘুমায় কন্যা রূপার খাটে কেশ
ময়ূরপঙ্খী যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ।

ঘুমপরী ॥

কি বললি ? তার নাম মধুমালা ? কি মিষ্টি নাম !

স্বপনপরীর গান

তার নামের চেয়ে রূপে সখি অনেক বেশী মউ
নব লক্ষের মালা পাবে সে হবে যার বউ
তারায় তারায় ছড়িয়ে আছে তারি রূপের রেশ
ময়ূরপঙ্খী যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ ॥

(পটপরিবর্তন—মধুমালার প্রাসাদ সাগরপুরীর মধ্যে)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[রাত্রি তৃতীয় প্রহর—চারিদিকে সমুদ্রের জল-কল্লোল—মাঝে সন্দ্বীপ—তারই কূলে মধুমালার সোনার প্রাসাদ। প্রাসাদের চারিপার্শ্বে ভীমাকৃতি প্রহরী মুক্ত তরবারি হস্তে পায়চারি করিতেছে। নিশুতি রাত্রের কালো ছায়ায়-ঢাকা সেই প্রাসাদ যেন জল-দেবীর বিলাসপুরী বলিয়া মনে হইতেছে। উপরে পরীদের ময়ূরপঙ্খী-রথের শব্দ ভ্রমর-গুঞ্জনের মত শুনাইতেছে—নীচে জলোচ্ছ্বাস সংগীতের মধ্যে দূরাগত ঘুমহারা পাখীর শ্রান্ত কণ্ঠস্বর—(এইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারিলে ভাল হয়)। পুরীর ছত্রিশ প্রাচীরে সাতমহলা তের কুঠরীর পারে মধুমালার শয়নকক্ষ। শয়ন শিয়রে তিন সারি ঘৃত প্রদীপ। তের থাক পালঙ্কে মধুমালা অঘোরে ঘুমাইতেছে। সাগর-তীরে এক নৌ-সেনা গান গাহিতে গাহিতে তরী বাহিয়া চলিয়া গেল।]

নৌ-সেনা বা মাঝির গান

নিঝুমে নিদ্রা যায় রে মধুমালা রাজার ঝিয়ারি
যায় নিদ্রা নিদ্রা যায় রূপের কেয়ারি রে
মধুমালা রাজার ঝিয়ারি ॥

দলমল করে কন্যার এলোকেশ
পালঙ্কে লুটায় রে তার আলুথালু বেশ
ফুল শয্যায় ঘুমায় যে চাঁদের পিয়ারী রে
মধুমালা রাজার ঝিয়ারি ॥

(অদূরে ঘুমপরী ও স্বপনপরীর গান শোনা গেল)

ঘুম আয় ঘুম আয় ঘুম ঘুম ঘুম
মধুমালার দেশ ঘুমে নিশুতি নিঝ্‌ঝুম।

(দেখিতে দেখিতে হাই তুলিয়া সকল প্রহরী দাস-দাসী ঘুমাইয়া পড়িল। মদনকুমারের পালঙ্ক লইয়া ঘুমপরী ও স্বপনপরী মধুমালার পালঙ্কের দক্ষিণে রাখিল—অমনি হাজারো সাপ হাজারো ফণাতে মাণিক-প্রদীপ জ্বালাইয়া দিল। অসম্বৃত—কেশ বেশ রাজকন্যা মধুমালা অঘোরে ঘুমাইতেছে দেখা গেল। "কন্যার সিঁথিতে পাটিতে ফুল ফুল-ঢালা সারা অঙ্গ গায়"। শতদলের পাপড়ি দিয়ে বিছানো শয্যা। ঘুমপরী নিমেষ-হারা নয়নে সে রূপসুধা পান করিতে লাগিল। তাহার মুখে কথা নাই। স্বপনপরীর গান—)

গান

ভোরের তরুণ অরুণে আর পূর্ণিমার চাঁদে
পাশাপাশি শুয়ে লো দেখ্ এক শয্যায় কাঁদে।
রাজার কুমার গড়া যেন ভোরের আলো দিয়ে
রাজকন্যার সৃষ্টি যেন পদ্ম পাপড়ি নিয়ে
(আমি) দেখি সুন্দর বিধাতারে এ দুই রূপের ফাঁদে ॥

স্বপনপরী ॥ (ঠেলিয়া)
ঘুমপরী! ঘুমপরী! তুই ঘুমুচ্ছিস নাকি?

ঘুমপরী ॥ (দুই হাতে চোখ কচ্‌লে)
বোন স্বপনপরী, আজ নয়ন আমার সার্থক হ'ল। আমার রূপের তৃষ্ণা মিটল। এ রূপের দুই ডালা নিঠুর বিধি কোন্ প্রাণে দুই ঠাঁই ক'রে রেখেছিল, তাই ভাবছি।

গান

কি অনল জ্বলে লো সই কি অনল জ্বলে
নয়ন ভর্‌ল জলে লো সই আমার হিয়ার তলে
কি অনল জ্বলে ॥

(আমি) উদাসী পাগল হয়ে না ত্যজিলাম কায়া
এই চাঁদের মুখে পড়ল আমার রাহুল প্রেমের ছায়া
মোর বুকের মাঝে সাত সিন্দূর এ কি ঢেউ উথলে
কি অনল জ্বলে ॥

স্বপনপরী ॥

কে জিত্‌ল ?

ঘুমপরী ॥

তুই ! আমারই হার।

গান

আমি হেরে এবার নেবো লো সই বঁধুর গলার হার।

স্বপনপরী ॥

না, তুইই জিতেছিস, আমারই হার।

গান

হার মেনে তুই জিতবি ওলো হবে না তা আর ॥

ঘুমপরী ॥

আমাদের দু' জনারই হার হ'ল।

স্বপনপরী ॥

শুধু হার হ'ল না লো, গলার হার হ'ল—এই দুঃখ এই বেদনাকে গলার হার ক'রে চল্‌ দেশে দেশে কেঁদে বেড়াই।

ঘুমপরী ॥

কাঁদতে ত হবেই তার আগে যার কাছে আমাদের হার

হ'ল তার সঙ্গে আঁখিতে আঁখিতে রাখী বেঁধে দিয়ে যাই, তবে না বেদনার পাত্র কানায় কানায় পুরে উঠবে। ওদের জাগিয়ে দিয়ে আড়াল থেকে দেখি ওরা কি করে।

(ফুলের পাখা দিয়ে বাতাস দিল)

স্বপনপরী ॥

ওরে হতভাগী! করলি কি, এদের যে যাকে দেখবে সেই যে উদাসী হয়ে যাবে!

[বলিতে বলিতে ঘুমের ঘোরে মদনকুমারের একখানা হাত মধুমালার গায়ে আসিয়া পড়িল। মধুমালা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া পার্শ্বে নিদ্রিত রাজপুত্রকে দেখিয়াই শিয়র হইতে তরবারি লইয়া রাজকুমারের বক্ষের উপর ধরিল—ধরিয়াই নিদ্রিত কুমারের সুন্দর মুখখানি দেখিয়া শিহরিয়া ঝনঝনাৎ শব্দে তরবারি দূরে ফেলিয়া দিল—সেই শব্দে রাজপুত্রও চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। জাগিয়াই সম্মুখে সৌন্দর্যের প্রতিমা রাজকন্যাকে দেখিয়া অভিভূতের মত নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল।]

মধুমালা ॥

কে? কে তুমি চোর? দেব হও, দানব হও কিংবা অন্য কোনো জন হও সুন্দর মুখে সত্য পরিচয় দাও!

মদনকুমার ॥

আমি?—আমি—

(রাজপুত্রের চোখে জল দেখা দিল)

মধুমালা ॥

হ্যাঁ, তুমি। কোথায় তোমার দেশ, তোমার নাম কি? তুমি সাত সাগর সাত শ' প্রহরীর পাহারা এড়িয়ে কেমন ক'রে

এখানে এলে? তুমি মায়াবী, তুমি যাদুকর, তুমি চোর! এর প্রতিফল মৃত্যু।

(মধুমালা দুষ্ট হাসি লুকাইল অন্যদিকে চাহিয়া)

মদনকুমার ॥

আমি সত্য বলছি—আমায় বিশ্বাস কর দেবী, আমি চোর নই—দেব নই—মায়াবী নই—আমি এই পৃথিবীরই মানুষ। আমি কাঞ্চননগরের যুবরাজ—আমার নাম মদনকুমার। আমার পিতার নাম রাজাধিরাজ দণ্ডধর। আর তুমি—তুমি কে? আমি কি স্বপ্নে চাঁদের দেশে এসেছি? তুমি চাঁদের দেশের রাজকন্যা?

মধুমালা ॥ (বালিকার মত চঞ্চল হাসি হাসিয়া ফুলের পর ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে বলিতে লাগিলেন)

আমার নাম মধুমালা—আমি সন্দ্বীপের রাজকন্যা—আমার পিতার নাম মহারাজাধিরাজ তাম্বুল।

(রাজপুত্রও এইবার নির্ভয়ে হাসিয়া উঠিলেন)

মদনকুমার ॥

কিন্তু, আমি এখানে এতদূরে তোমার দেশে এই সাগর-ঘেরা দ্বীপে এলুম কি ক'রে? আমরা বোধহয় স্বপ্ন দেখছি, না?

মধুমালা ॥

স্বপ্নই যদি হয়—তবে এ মধুর স্বপ্নকে মধুরতর ক'রে নিতে বাধা কি বন্ধু? একটু পরেই ত স্বপ্ন যাবে টুটে—দিনের ফুল উঠবে ফুটে—তুমি চলে যাবে তোমার দেশে আর—আর আমি কাঁদব ঐ সাগরের সাথে চিরদিন চিররাত্রি।

মদনকুমার ॥

না, না, ও কথা ব'লো না! (হাত ধরিতে গিয়া পিছাইয়া আসিল) আমাদের এ রাত্রির আর শেষ হবে না, স্বপ্ন আর টুটবে না—সেই আশার কথা বল।

মধুমালা ॥

তুমি কাছে এসে চলে গেলে কেন? ধর, আমার হাত ধর, আমার বুক কাঁপছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের গাঙ-চিল সিন্ধুকপোত ডেকে উঠছে আর আমার মনে হচ্ছে এখনই বুঝি প্রভাত হয়ে যাবে। (বাতায়নে গিয়া) ঐ দেখ, এখনো শুকতারা ওঠে নি—ধর, আমার হাত ধর।

(রাজপুত্র হাত ধরিলেন। অশ্রুমুখী মধুমালা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।)

মদনকুমার ॥

তুমি এত কাঁপছ কেন? এই যে আমি তোমার হাতের কাছে—আমায় হাত দিয়ে ধর।

গান

(তোমার) চন্দন রং উত্তরীয় মেঘ ডম্বুর শাড়ি
কাজল-বরণ কেশ কন্যা চল আমার বাড়ী ॥
চির হয়ে কি নেমে এল চঞ্চল বিজলী
ফুটল কি আজ তোমার দেহে পূর্ণ চাঁদের কলি।
রতি কি আজ নেমে এল পতিরে তার ছাড়ি
কন্যা চল আমার বাড়ী ॥

মধুমালার গান

সাগরে কি ফিরে এলে নীল সাগরের চাঁদ ?
তাই কান্নার জোয়ারে তার ভাঙল কূলের বাঁধ।
দূর আকাশে লক্ষ তারা
চেয়ে আছে তন্দ্রাহারা
তারা তোমার রূপ নিয়ে কি করে কাড়াকাড়ি
কুমার ! থাক আমার বাড়া ॥

মধুমালা ॥

দেখ কুমার ! সাত সমুদ্র সাত শ' প্রহরীর চোখ এড়িয়ে সাত-ছত্রিশ তের কুঠ্‌রী পার হয়ে তুমি যখন বিধাতার বর হয়ে এসেছ—তখন—

(রাজকন্যা লজ্জায় চুপ করিলেন)

মদনকুমার ॥

থামলে কেন ? বল—বল কি বলছিলে, বল। বল।

মধুমালা ॥ (লজ্জা-বিজড়িত স্বরে)

এ সেই লীলা রসিক বিধাতা পুরুষেরই ইঙ্গিত যে তুমি আমার বর হও।

মদনকুমার ॥

আমি ? আমি—তোমার বর হব ?

মধুমালা ॥ (ব্যাকুল স্বরে)

কেন ? কেন তা হয় না ?

মদনকুমার ॥

তোমার এই অপরূপ রূপের মালা যার গলায় শোভা

পাবে—তাকে বোধহয় বিধাতা আজও সৃষ্টি ক'রে উঠতে পারেন নি।

মদনকুমার ॥

তুমি কি তোমার নিজেকে কোনোদিন দেখেছ? দেখলে এ কথা বলতে না। এই নাও আমার অঙ্গুরী—তুমি নাও, তোমার অঙ্গুরী আমায় পরিয়ে দাও। এই নাও আমার নবলক্ষের রত্নহার—তুমি দাও তোমার ঐ পদ্মমণির মালা।

(মালা বদল। অপর কক্ষে উলুধ্বনির শব্দ)

মদনকুমার ॥

ওকি, উলু দেয় কে?

মধুমালা ॥ (হাসিয়া)

আমার শুকসারি। কিছুদিন আগে আমার দিদির বিয়েতে উলুধ্বনি শুনে ওরা পুরুষ নারীকে কাছাকাছি দেখলেই উলুধ্বনি ক'রে ওঠে।

মদনকুমার ॥

মালা! প্রিয়া! অঙ্গুরী যদি নিলে, মালা যদি দিলে, তোমার গায়ের চন্দন-রং চাদর আমায় দাও, আমার ধানী রঙের চাদর তুমি নাও। (গুনগুন সুরে গান)

গান

আহা! সুনীল নীরদে ঢাকিল অরুণ
নীহারে ঢাকিল শশী।

মধুমালার গান

চন্দন মেখে শুকতারা হাসে মোর
বাতায়নে বসি।

মধুমালা ॥

এ কি ! এ কি ! ঐ দেখ, শুকতারা উঠেছে পূব-তোরণে ! আমায় জড়িয়ে ধর, একেবারে প্রাণের কাছে লুকিয়ে রাখ, তুমি চলে যেয়ো না—তুমি যেয়ো না !

(বলিতে বলিতে মধুমালা পালঙ্কে ঘুমে অভিভূত হইয়া লুটাইয়া পড়িল—মদনকুমারও তাহারই পার্শ্বে ঘুম বিজড়িত নয়নে লুটাইয়া পড়িল)

ঘুমপরী ॥

আমি ওদের চোখে ঘুম দিয়েছি—আর দেরি নয়—মালা কেঁদে বলছিল "তুমি যেয়ো না", কিন্তু ওদের যেতেই হবে !

গান

পূর্ব সাগরে ডুব দিয়ে ঐ সোনার রবি উঠল রে।
রাতের চোখের অশ্রু ঝ'রে কুসুম হয়ে ফুটল রে ॥
যাত্রী ওরে যেতে হবে
গভীর ব্যথা পেতে হবে
তাই মিলন রাতের বালুর মালা জাগরণে টুটল রে ॥

স্বপনপরী ॥

না, না, ওদের মাঝে এই বিরহের যবনিকা ফেলে দিস্ নে ঘুমপরী। আমি এখনও যেন শুনছি মধুমালার করুণ মিনতি—

গান

তুমি যেয়ো না তুমি যেয়ো না
মিলনের সাধ না মিটিতে চাঁদ বিদায় চেয়ো না চেয়ো না ॥

শোনো গো আমার বক্ষের মাঝে
সাত সাগরের ক্রন্দন বাজে,
জোয়ারের তরী এখনই বন্ধু ভাটার স্রোতে বেয়ো না ॥

ঘুমপরী ॥

বিরহের আগুনে পুড়ে ওদের প্রেমের সোনা খাঁটি হবে সই, চল্ আর দেরি করিস্ নে। দাঁড়া তার আগে ওদের পালঙ্ক বদল ক'রে নিই।

পালঙ্ক বদল করিতে করিতে গান

ঘুম যবে ভাঙবে কন্যা—স্বপন যাবে টুটে
সুখ স্বপন যাবে টুটে।
ফুল-শয্যার ফুটবে কাঁটা প্রভাত বেলা উঠে

(পালঙ্ক ময়ূরপঙ্খীতে লইয়া উঠিয়া গেল—পটপরিবর্তন—আবার সেই হিমালয়ের সানুদেশ দেখা গেল। তখন রক্ত-আঁখি তরুণ অরুণ জাগিয়াছে—তারই রঙে হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় রঙের আবীর খেলা চলিয়াছে। পরী দুইজন রাজপুত্রের পালঙ্ক যেখানে ছিল সেইখানে রাখিয়া দিল।)

স্বপনপরী ॥

ঘুমপরী! তুই কি আর ইন্দ্রসভায় স্বর্গপুরীতে ফিরতে পারবি? যে তরুণ অরুণকে তাঁবুতে রেখে এলি, তারই মায়া পূর্ব তোরণে চুপ ক'রে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

(হইহই শব্দে রাজার প্রহরীরা জাগিয়া উঠিল—তাঁবুতে প্রভাতী সানাই—কাড়ানাকাড়া বাজিয়া উঠিল।)

রুদ্রকুমার ॥

কুমার! বন্ধু! বহুক্ষণ হ'ল প্রভাত হয়েছে, ওঠ।

মদনকুমার ॥ (জাগিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে চাহিয়া)

এ কোথায় ? এ আমি কোথায় এসেছি ? আমার মধুমালা —মধুমালা কই ?

রুদ্রকুমার ॥ (হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া)

তোমার বুঝি এখনও স্বপ্নের ঘোর কাটে নি ! কোথাকার কে মধুমালা ? (আবার হাসিয়া উঠিল)

মদনকুমার ॥

হ্যাঁ, আমার মধুমালা ! সন্দ্বীপের রাজকুমারী, কাঞ্চন নগরের বধূরাণী, আমার প্রিয়া মধুমালা। কে—কে আমায় এখানে আনলে ? কোথায় সেই সাগর-ঘেরা দ্বীপ ? কোথায় তার সেই সাগর তীরের সোনার পুরী ? তুমি—তুমি কে ? তোমাকে ত আমি চিনি নে। মধুমালা ! মধুমালা !

(রাজপুত্র উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া যাইতে চাহিলেন।)

রুদ্রকুমার ॥ (রাজকুমারকে ধরিয়া ফেলিয়া)

বন্ধু ! রাজপুত্র ! আমি—আমি তোমার সখা রুদ্রকুমার—তোমাদের সেনাপতির পুত্র—আমায় চিনতে পারছ না ?

মদনকুমার ॥ (খানিক উন্মাদের মত শূন্যদৃষ্টিতে তাকাইয়া)

তুমি ? সখা তুমি ? তুমি এখানে কি ক'রে এলে ? এর চারিধারে মহাসিন্ধু গভীর গর্জনে নৃত্য করছে—দ্বারে দ্বারে যমদূতের মত প্রহরী। চুপ—আস্তে—শুনতে পেলে আর আস্ত রাখবে না—হয় হত্যা করবে—না হয় পাষাণ কারাগারে নিক্ষেপ করবে। রাজকন্যার এ ঘরে চন্দ্র-সূর্য পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু মধুমালা কোথায় গেল ! আমার মধুমালা !

রুদ্রকুমার ॥

তুমি কি বলছ সখা? কোথায় মধুমালা! কাল শিকার করতে এসে এইখানে রাত্রে শুয়েছিলে, তোমার কি কিছু মনে পড়ছে না?

মদনকুমার ॥

শুয়েছিলাম মনে পড়ে, কিন্তু তার পর যে গেলাম আমার মধুমালার দেশে—সেইখানে শুকতারাকে সাক্ষী রেখে আমাদের মালা বদল হ'ল—এই দেখ—এই দেখ তার গলার নবলক্ষের রত্নমালা—এই দেখ তার অঙ্গুরী—এই দেখ তার চন্দন রং চাদর—দেখেছ—দেখেছ। কোথায় গেল আমার মধুমালা—আমার মধুমালা!

রুদ্রকুমার ॥

তাইত! এ কি! এ কোন্ মায়াধরের খেলা? মায়াপুরীতে আমরা শুয়েছিলাম—শুনেছি হিমালয়ের সানুদেশে অভিশপ্ত এক অরণ্য আছে—সেখানে এলেই লোকে নানারূপ মায়া দেখে—একি তবে সেই রম্য কানন? হে দেবাদিদেব শঙ্কর আশুতোষ ভোলানাথ, রক্ষা কর—আমরা অজ্ঞ নিরপরাধ—না জেনে যদি পাপ ক'রে থাকি, সর্ব-পাপ-হর, তুমি ছাড়া কে তা ক্ষমা করবে?—এ কি! এ সোনার পালঙ্ক কার? এ পালঙ্ক ত এখানে ছিল না। অয়স্কান্ত! অয়স্কান্ত!

অয়স্কান্ত ॥

সব দেখছি বন্ধু, সব শুনছি আড়ালে দাঁড়িয়ে। অয়স্কান্ত পয়স্বিনী কামধেনু নয় যে দুইয়ে যা চাইবে তাই পাবে। ব্রজে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্রীমদনমোহনের বসন বদলের কথা

শুনেছিলাম, খাট বদলের কথা ত শুনি নি। আমাদের মদনকুমার তার চেয়ে তিন কাঠি উপরে উঠে গেলেন দেখছি—আংটি বদল, মালা বদল (আর চাদর বদল যখন হয়েছে, তখন আদর বদল না হয়েছে তাই বা কে বলবে ?) কিন্তু সব বদলকে হার মানিয়েছে পালঙ্ক বদল। এখন অঙ্ক বদল কলঙ্ক-বদল কত কি বদল দেখবে দাদা! চল, এখানকার ডেরা যত শীগগীর পার ওঠাও। দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ ক'রে কোনো লাভ হবে না। কাল রাত্রে এখানে এসেই আমার গা কেমন ছমছম করছিল—এ পরীর আখড়া না হয়ে যায় না—নইলে বন এমন সাজানো-গোছানো হয়, দেখেছ ? বন ত নয় যেন অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ! ওঠাও ডেরা—তার পর বাপ-মার নয়নমণি বাপ-মার কোলে ফেলে দাও। গিয়ে পাত্রী খোঁজ, চোখে যৌবনের রং লেগেছে—এখন যে কোনো বধূর মালাকে মধুমালা মনে হবে, চল।

রুদ্রকুমার ॥

প্রহরী! (প্রণত প্রহরীর প্রবেশ) সৈন্যগণকে আদেশ দাও আমরা এখনই কাঞ্চননগর যাত্রা করব। (প্রহরীর প্রস্থান)

অয়স্কান্ত ॥

হায় হায়, শিকার করতে এসে বিড়ম্বনার আর অন্ত রইল না। রাজকুমারের হাতের শিকার হতে পশুপক্ষী ত অস্বীকার করলেই—তারও বাড়া রাজকুমার নিজেই শিকার হয়ে বসলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

[কাঞ্চননগরের রাজপ্রাসাদ। ধূলিধূসরিত মলিনকান্তি উন্মাদ মদনকুমার বসিয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দূরে চাহিয়া আছেন। রাজমহিষী পাটেশ্বরী তাহার গায়ে মাথায় নিবিড় স্নেহে হাত বুলাইতেছেন। পার্শ্বে পরিচারিকাবৃন্দ দাঁড়াইয়া—দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী।]

পাটেশ্বরী ॥

বাবা! লক্ষ্মী সোনা মাণিক আমার! পালঙ্কে উঠে বস —রাতদিন ধুলোয় গড়াগড়ি দিলে ত মধুমালাকে পাওয়া যাবে না।

মদনকুমার ॥

হ্যাঁ! মধুমালা! মধুমালা! তুমি তাকে দেখেছ? কিন্তু তুমি কে? তোমাকে দেখে আমার এত কান্না পাচ্ছে কেন? তোমাকে যেন হারিয়ে ফেলেছি—কোথায় কোন বনে!

পাটেশ্বরী ॥ (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

হায় আমার পোড়া কপাল! তোর মুখে একথা শোনার আগে কেন আমার মরণ হ'ল না? কে সে রাক্ষুসী মধুমালা—যে আমার ছেলেকে এমন গিলে খেয়েছে—যার মায়ায় তুই তোর মা'কে চিনতে পারছিস নে। উঃ! ভগবান!

মদনকুমার ॥

কে! মা? তুমি আমার মা? (ক্ষণিক একদৃষ্টে তাকাইয়া সরোদনে মা'র বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল) মা! মা! একি হ'ল

আমার ? কেন এমন হ'ল ? সত্যি সত্যি মা, সে মায়াবিনী, নইলে বার বৎসর ধরে পাষাণপুরীর কারাগারে যে মা আমার বক্ষে ধরে আমায় লালন-পালন করেছেন—এই পাঁচ বৎসর বাইরের আলোকে এসে তাকে আর চিনতে পারিনে! সে সত্যই মায়াবিনী—তার চোখে মায়া—তার রূপে মায়া, তার হাসিতে মধু, তার কান্নায় মধু, তার কেশে বেশে কথায় গানে মধু—তার মালায় মধু—সে মধুমাত্রা। মধুমালা। আমার মধুমালা!

পাটেশ্বরী ॥ (পরিচারিকাদের প্রতি)

ছেলে আমার দিশাহারা! তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কি হাঁ ক'রে? আমার ছেলে বুঝি সং, না? দে, গোলাপ জলের ছিটে দে, মহারাজকে খবর দে। এখনও রাজবৈদ্য এলেন না কেন?

মদনকুমার ॥ (পরিচারিকাদের প্রতি)

তোরা কে? মধুমালার সখি মধুমালার দেশের গান জানিস?

জনৈক পরিচারিকা ॥

মা! কাল যুবরাজ সারারাত্রি সারাদিন 'মধুমালার দেশ' বলে যে গানটি গেয়েছিলেন আমরা তা শিখে নিয়েছি—আমরা গাইব সে গান?

পাটেশ্বরী ॥

আহা! গা না বাছা! তোদের গান শুনে যদি বাছার আমার একটু জ্ঞান ফিরে আসে।

পরিচারিকাদের গান

কেউ বলতে পার কোথায় আমার মধুমালার দেশ ?

(রাজকুমার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

মদনকুমার ॥

গাও গাও আবার গাও কোথায় মধুমালার দেশ—

গান

কেউ বলতে পার কোথায় আমার মধুমালার দেশ ?
যার সাগর মাঝে স্বপন-পুরী মেঘ-বরণ বেশ
মধুমালার দেশ ॥

কোন্ মধু বাসরে এসে
(তাঁরে) দেখেছিলাম রাতের শেষে
(আমি) স্বপ্নে আজও দেখি তারি চন্দন-রং বেশ।
মধুমালার দেশ ॥

প্রথম শিকারে গিয়ে বিঁধল বিষের তীর—
সেই কন্যার কাজল মাখা ডাগর আঁখির।
তার নবলক্ষের মালা দোলে
দোলরে মোর প্রাণের তলে
আমি জেগে দেখি স্বপ্নে-দেখা সেই চোখের আবেশ
মধুমালার দেশ ॥

রাজা দণ্ডধর ॥ (ব্যাকুল হয়ে অভিভূতের মত)

রাণী ! পাটেশ্বরী ! আমি আমার উপাস্য দেবতা মহাকালের প্রত্যাদেশ পেয়েছি। কাল থেকে সারাদিন সারারাত্রি তাঁর মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়েছিলুম—আমার

একমাত্র বংশ-প্রদীপের কেন এ অবস্থা হ'ল জানবার জন্য। আজ সকালে স্বপ্ন দেখলাম যেন মহাকাল বলছেন, "ওকে আজই সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে সাগর জলে ভাসিয়ে দে। মধুমালাকে নিয়ে সে আবার ফিরে আসবে।" রাণী! আজই—আজই ওকে পাঠিয়ে দেখো সাগরপারের দেশে—সাথে যাবে আমার সমস্ত নৌ-সেনা—পদ্মার বুকের সমস্ত তরণী সকল মাঝিমাল্লা। ওযে আমার দেবতার দেওয়া নির্মাল্য—তাঁরই নাম নিয়ে ওকে স্রোতের পথে ভাসিয়ে দাও—দেবতার নির্মাল্য আবার দেবতার শ্রীচরণে এসে ঠেকবে।

(বলিতে বলিতে রাজার কণ্ঠস্বর ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল। রাজা পালঙ্কের উপাধানে মুখ লুকাইলেন।)

মদনকুমার ॥ (রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া—বুকের কাছে মুখ রাখিয়া) বাবা! বাবা মণি! দেবে? দেবে আমায় যেতে আমার মধুমালার কাছে—বাবা কি রকম লক্ষীছেলে—দেখেছ মা-মণি? তুমি কিন্তু ভারী দুষ্টু—কিছুতেই ছেড়ে দিতে চাও না। (মায়ের আঁচল লইয়া চোখ মুখ মুছিতে মুছিতে) মা! মা! চেয়ে দেখ, তোমার আঁচল দিয়ে আমার মাথা মুখ মুছছি—এতেই আমার সব আলাই-বালাই দূর হয়ে গেল—এই আঁচলের প্রসাদে আমার বাধা বিঘ্ন উড়ে গেল। ও কি মা! লক্ষীমেয়ে, কেঁদো না—আমি আবার ফিরে আসব তোমার শ্রীচরণ সেবার দাসী নিয়ে। (বাবাকে জড়াইয়া ধরিয়া) বাবা! আমি রাজসভায় যাব তোমার সাথে। মা-মণি তুমিও চল না—আমি তোমার

কোলের কাছটিতে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দেবো—রাজ্যসুদ্ধ লোক দেখুক যে, আমি ভাল হয়ে গেছি।

পাটেশ্বরী ॥

ওরে, ওরে মায়াবী! বলিস নে, বলিস নে, কী ক'রে এই সোনার চাঁদকে আমি সাগর-জলে ভাসিয়ে দেবো? ভাসিয়ে দিয়ে কী ক'রে একলা ঘরে থাকব? (রাজাকে) ওগো! তুমি যাও না সৈন্য নিয়ে সেই সাগর-পুরী থেকে জয় ক'রে আন সেই কন্যাকে—আমি দেখি সেই রাক্ষসের মেয়েকে—তার কত রূপ, কত গুণ যে আমার কুমারকে এমন পাগল করে!

মদনকুমার ॥

মা! তুমি বড্ডো হিংসুটে! একলা বাপের একলা মেয়ে কি না! চল না মা রাজসভায়, আমার আর ঘরে থাকতে ভাল লাগছে না!

রাজা ॥ (চোখ টিপিয়া)

তাই চল না রাণী। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

আর দেখ বাবা মদন-মণি! সেই যে সেকেন্দর শা ফকির, যার জারি গান শুনতে তুমি এত ভালবাসতে, সে তার দলবল নিয়ে এসেছে তুমি অসুস্থ শুনে। আজ রাজ-সভাতেই তার গান হবে—কেমন শুনবে ত?

মদনকুমার ॥

সেই সেকেন্দর শা, যার দাড়ি দিয়ে আমি বেণী বাঁধতাম! নিশ্চয়ই যাব বাবা তার গান শুনতে। বাবা লক্ষ্মী, মা দুষ্টু, বাবা লক্ষ্মী, মা দুষ্টু (বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল)

[রাজসভা—সমস্ত সভাসদ্ বসিয়া আছেন—সেকেন্দর শা তাহার দলবল লইয়া আসিয়া কুর্নিশ করিল]

সেকেন্দর শা ॥

আমাগো রাজকুমার কই—রাজকুমার? বুড়া অইয়্যা গেছি, চক্ষে আর দেখবার পাই না—

(মদনকুমার ছুটিয়া আসিয়া সেকেন্দর শা'র গলা জড়াইয়া ধরিল)

মদনকুমার ॥

দাহ্! দাহ্! এই যে আমি—

সেকেন্দর শা ॥ (বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে)

দাহ্মণি! দাহ্মণি আমার! কোন্ হালায় কইছেরে আমার সোনার দাহ্ পাগল হইয়া গেছে? হেই কথা শুইন্যা এই তিনডা দিন কাইন্দা কাইন্দা পথ চলছি না ত দৌড় পাইরা আসতেছি—এহন আমার সোনার চাঁদ দাহুরে দেখলাম, দেইখ্যা পরাণডা জুরাইলাম।

মদনকুমার ॥ (লুকাইয়া চোখ মুছিয়া)

কিন্তু দাহ্! এবার তোমার দাড়ি এত ছোট হয়ে গেল কেন? (মাপিয়া) হাঁ চারডা আঙুল ছোট হইয়্যা গেছে গ্যা! হ। হ। পাতলা ত হইয়া গেছে। এ্যা হে হে হে হে! দাহুর আমার দাড়িতে পাক ধরেছে—না না টাক পড়েছে।

সেকেন্দর শা ॥

আর দাহ্! তোমার লাহান যত হালায় টাইন্যা টাইন্যা আমার দাড়ির দফা সাইর‍্যা দিছে। হালায় ছাগলের পালে যেন শাকের ক্ষেত দেখছে!

মদনকুমার ॥

দাদু আমি এখন মার কাছে বসি গিয়ে। তুমি এখন গান শোনাও, কতদিন তোমার গান শুনি নি!

সেকেন্দর শা ॥

হ! হ! গাইমুই ত, তোমারে গান হুনাইমু না ত আর কোন্ হালারে হুনামু? হালার যত ছাগলের পাল কয় কিনা দাদু আমার পাগল হইছে! হঃ! কই রে ইন্তাজ! মোন্তাজ বিছুত্যা সব আস্ছস্ ত?

দলের সকলে ॥

হয় হয়—হক্কলে আইছি আইগ্‌গ্যা!

সেকেন্দর শা ॥

এইবার মহারাজের আইগ্যা লইয়া গান ধরি। সভার সক্কলে মন দিয়া শোনেন। আমি যে গান গাইমু তা আমাদের এই রাজপুত্রেরই গান। কত দুখ্যু দিয়ে আল্লায় এই রাজপুত্তুর দিয়াছেন তারই কাহিনী কইমু—আপনারা দয়া কইর্যা একটু চুপ কইর্যা শুনবেন—গোল করবেন না। আপনারা গোল করলে আমার গানে গোলমাল হইয়া যাইব গিয়া। আপনারা রঙ্গমঞ্চে দরবারে আসরে ভাল ভাল গান শোনেন। আমি মুখ্খু সুখ্খু সেবক, আমার গান আপনাদের ভাল লাগব না, তবু দয়া কইর্যা শোনেন যদি তাইলে গরীব দুইটা পয়সা পায়। যদি কেউ দয়া কইর্যা কিছু দ্যান, এইখানে ছুইর্যা দিবেন। দোহাই, এই বুইর্যারে হাতে মারুন সইব, কিন্তু ভাতে মাইরবেন না।

এই কাঞ্চননগরের বাদ্‌শা নাম দণ্ডধর,
একচ্ছত্র রাজপাট যাঁর লাখ লাখ নফর।
রাজার বাড়ীতে হলুদ বাঁটে হীরার
শিল নোড়াতে—
সোনারূপায় ধরছে ছাতা শুকায় লইয়া ছাতে।
এত থেকেও সুখ নাইরে রাজার একি হৈল।
সাত-সলিতা ঘিয়ের বাতি নাই যেন রে তৈল।
রাজ্যসুদ্ধা কাঁদে যত ছাইল্যা মাইয়্যা বুড়া,
রাজার এ ধন কে খাইব, রাজা যে আঁটকুড়া।
ভোরে উইঠ্যা দেখে যদি কেউ
আঁটকুড়ার মুখ—
সেদিন অন্ন জোটে না তার, তার মুখে দেয় থুক।
তাই না শুইনা রাজা দিলেন মন্দিরেতে খিল্‌
আঁটকুড়া মুখ দেখাইবেন না আর তেনায় এক তিল।
পানের বাটার পান রইল আপন ঠাঁয় পইর‍্যা,
সোনার গাড়ুর তীর্থের জল কাঁদে ঝইব্যা ঝইব্যা।
তাই না দেইখ্যা দেবতার মনে হইল কিঞ্চিৎ দয়া
বলেন রাজা ওঠ ওঠ—পুত্র হইব পয়া।
বলেন কি বলেন
তপ্ত সোনার কুমার তোমার ভরবে রাজপুরী
কিন্তু রাজা তাকে পরী করবে বুঝি চুরি।
আঁধার ঘরে রেখো তারে বারোটি বৎসর
পাতালপুরীর মধ্যে রাজা বানাইয়া এক ঘর।

চাঁদ সুরুত দেখে যেন তোমার চাঁদের মুখ
বারো বৎসর থাকলে সেথায় কাটবে সকল দুখ।
বারো বৎসর আগে রাজা না খুলিও দ্বার
খুলিলে উদাসী হয়ে ঘুরিবে সংসার।
মদনকুমার নাম রাখিও এই না কবচ লও
(এই) কবচ রাণীর গলায় বাইন্দ্যা পুত্রের আশায় রও।
কইব কি সে দুঃখের কথা, সোনার ছাওয়াল লইয়া
পাতালপুরীর মাঝে রাখল পাগল হইয়া।
বারো বছর পূর্ণ হইবার তিনদিন যবে বাকী—
রাজপুত্র ত কাইন্দা কাইন্দা ফুলাইল তার আঁখি।
বলে, মাগো চন্দ্র সূর্য জন্মে দেখলাম নাকো
একটিবার মা দেখবার দাও গো মোর মিনতি রাখ।
কাইন্দা কাইন্দা রাজপুত্রের যায় বুঝি দম ছাইড়্যা
মনের দুয়ার খুইল্যা দিল হায়রে মায়ার হাইর্যা।
সেই নারে রাজপুত্র একদিন শিকারেতে যায়
সৈন্য লস্কর লইয়া রে ভাই কাঁদাইয়া বাপ মায়।
লোকের মুখে শুনলাম হইল শিকারে এক জ্বালা
স্বপ্নেতে রাজকুমার দেখল কন্যা মধুমালা।

মদনকুমার ॥

মধুমালা! মধুমালা! আমার মধুমালা! (বলিতে বলিতে উন্মাদের মত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে রাজকুমার সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন)

রাজা ॥

ওরে ধর্ ধর্—ওকে ধর্—মন্ত্রী! সেনাপতি! ওকে ধরে

রাখ—যেতে দিয়ো না। তুমি কেন মধুমালার কথা বললে শা সাহেব?

সেকেন্দর শা ॥

তুমি ভয় করো না রাজা। ওর উপরে আল্লার রহম হইছে, ও জীবনের বড় পাতায় প্রেমকে পাইছে—মজনুর মত লায়লিকে পাইছে—ফরহাদের মত শিরীকে পাইছে—এই লায়লিকে যে পায় লা এলাকে পাইতে তার দেরি হয় না!

[পদ্মা নদীর তীর—সপ্তডিঙা মধুকর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে—জাহাজ ভর্তি নৌ-সেনা ও মাঝি-মাল্লা—কূলে পুরনারীরা বরণের ডালা হাতে লইয়া চক্ষু মুছিতেছে।]

মদনকুমার ॥ (পিতামাতার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া)

বাবা! মা! তাহলে আমি আসি। তোমরা কিচ্ছু ভেবো না—আমি দেবতার কৃপায় আবার ফিরে আসব। তোমার পায়ে পড়ি মা, তুমি অমন ক'রে কেঁদো না—তোমার চোখের জল দেখে গেলে আমার নদী-পথের জল দ্বিগুণ হয়ে উঠবে।

রাজা ॥

জানি পুত্র, স্বয়ং মহাকাল যখন বলেছেন, তুমি ফিরে আসবেই—তবু—তবু—(আর বলিতে পারিলেন না—কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।)

রাণী ॥

বাবা রুদ্রকুমার! অয়স্কান্ত! তোমরা তবে চোখে চোখে রেখো—ছায়ার মত ওর সাথে সাথে থেকো—আমার ঘরের বাতি—অঞ্চলের নিধি তোমাদের হাতে সঁপে দিলুম—

শোন নাবিকগণ, মাঝি-মাল্লা সকলে শোন—তোমরা সকলে আমার পুত্র। আমার মদনকুমার রাজপুত্র নয়—যুবরাজ নয়—ওকে মনে করবে তোমাদেরই আর-এক ছোট ভাই।

সকলে ॥

মাগো! তোমার পায়ের ধুলো দাও আমাদের মাথায়। ঐ চরণ-ধূলির প্রসাদে ওকে আবার তোমার কোলে ফিরিয়ে এনে দেবো। (তরী চলিয়া যাইতে লাগিল)

রাজা ॥

রাণী! রাণী! তুমি একি করলে? ওযে দেবতার নির্মাল্য—দেবতার পায়ে সঁপে না দিয়ে ওকে দুর্বল মানুষের হাতে সঁপে দিলে! মহাকাল আমার উপাস্য দেবতা! রক্ষা কর, রক্ষা কর ওকে। আমাদের অজ্ঞতার অপরাধ ক্ষমা কর!

রাণী ॥

আমার মদন-মণি! আমার কুমার! আমার খোকা! ফিরে আয়, ফিয়ে আয়! (মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন)

(দূর হইতে সপ্তডিঙার মাঝিদের গান শোনা গেল)

কেউ কইতে পার, কোথায় আমার মধুমালার দেশ?

[নীল আকাশে সাদা মেঘের মাঝে ঘুমপরী ও স্বপনপরী শুক্লা একাদশী তিথির চাঁদের গায়ে হেলান দিয়ে গাহিতেছিল]

গান

ঘুমপরী ॥

আমারে ভাসালে অসীম আকাশে
তোমারে ভাসানু জলে,

স্বপনপরী ॥

মাটির মানুষ বোঝে না বেদনা
বুঝি ত দেবতা হলে ॥

ঘুমপরী ॥

ওগো সুন্দর তুমি ত জান না
ভালবাসার কি নিবিড় বেদনা

স্বপনপরী ॥

জান না ত আমি কাঁদি কত
তোমারে কাঁদাই বলে ॥

ঘুমপরী ॥

চল্ দিদি, রাজপুত্রের অবস্থা ত দেখলি—একবার রাজকন্যার অবস্থাটা দেখে আসি—সেই যে বেচারীকে ফেলে এসেছি, একবার ভুলেও দেখতে গেলুম না।

স্বপনপরী ॥

তা সত্যি, সতীনের বুক-চাপড়ানি দেখতে পেলে আমাদের বুকের ব্যথা অনেকটা কমবে—চল্।

(মধুমালার সোনার পুরী)

মধুমালা ॥ (পাগলিনীর বেশে)

কুমার! কুমার! এই যে সে আমার কাছে ছিল! আমার স্বামী আমার প্রিয়, কোথায়—কোথায় গেল সে?

চন্দনা ॥

সই, স্থির হও। তোমার কুমার? স্বপ্ন কখনও সত্য হয়? কাঞ্চননগর বলে কোনো কালে কোনো দেশের নাম শুনিনি। তার আবার রাজপুত্র—নাম কিনা মদনকুমার!

মধুমালা ॥

এ স্বপ্ন নয় চন্দনা, সাক্ষী আছে ভোরের শুকতারা, পিঞ্জরের শুকসারি আর এই—এই ধানী রঙের উত্তরীয়। তার এই অঙ্গুরী, এই পদ্মমণির মালা এবং সবাই জানে সে এসেছিল —পূর্ণিমার চাঁদ সাগর সিনানে এসেছিল—তার পর চলে গেল ঐ দূর আকাশে।

চন্দনা ॥

সই, এ সব সত্যি, তাই এ নিয়ে রাজ্যময় হুলস্থূল পড়ে গেছে। কিন্তু এই সাগর-ঘেরা দ্বীপে এত প্রহরীর চোখ এড়িয়ে বিদ্যাধর ছাড়া মানুষ কখনও আসতে পারে না। সই, এখন একটু ঘুমোও, আর কত রাতের পর রাত এমনি জেগে থাকবে?

মধুমালা ॥

সে ত মানুষ নয় চন্দনা, সে যে আকাশের চাঁদ, আমার অন্তর দেবতা। আমি দিবানিশি যে সুন্দরের ধ্যান করেছি এই সাগর-ঘেরা দ্বীপের সোনার পুরীতে সেদিন রাতে সেই সুন্দর এসেছিল রূপ নিয়ে। রাতের তারার মত সে দিনের আলো সইতে পারে না। (বাতি কমিয়া আসিতে লাগিল) একি! আমার চোখে চারিদিক্ এমন অন্ধকার হয়ে আসছে কেন? কে—কে আমার বাতি নেভালে? কে—কে তুমি, আমার নিশিথিনীকে এমন অন্ধকারে ঢেকে দিলে? ও! কুমার! তোমার রূপের আলোতে ঘর আলো হবে বলে বুঝি সব বাতি নিভিয়ে দিয়েছ? লজ্জা? কাকে লজ্জা? ও আমার সই—চন্দনা। ওকে আবার

লজ্জা কিসের? ওগো শুনছ? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার নাম ধরে ডাক না? কই, কোথায় গেলে? ওগো শুনছ? (বলিতে বলিতে আবেগে মূর্ছিতা হইয়া পড়িল।)

চন্দনা ॥

সই—সই মধুমালা—হায় হায়, কোন দিকে যাই আমি? ওদিকে মহারাজ মহারাণী উপোস দিয়ে কাঁদছেন, এদিকে সই মূর্ছিতা! সই—ও সই—(উঠিয়া গিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে জলের পাত্র হস্তে ফিরিয়া আসিল। মধুমালার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়া) কথা বলো—কথা বলো সই! স্বপ্নে যাকে দেখেছ সে বিদ্যাধর ছাড়া কেউ নয়। কুমার কি ক'রে আসবেন এই সাগর-ঘেরা সোনার পুরীতে?

মধুমালা ॥ (চক্ষু উন্মিলিত করিয়া)

কি বললে সই, কুমার এসেছেন? কোথায় তিনি—কোথায় আমার জনম জনমের স্বামী? কোথায়—

চন্দনা ॥

একটু শান্ত হও সই—মহারাজ মহারাণীর দিকে ফিরে তাকাও। তোমার এ হাল দেখে তাঁরা উপোস ক'রে পাশের ঘরে কাঁদছেন। তাঁরা এসে তোমাকে কত বোঝালেন। তুমি একটিবার তাঁদের দিকে চেয়ে দেখলে না—তাঁদের চিনতে পারলে না। একি তাঁদের কম দুঃখ।

মধুমালা ॥

বাবা? মা? কোথায়—কোথায় তাঁরা? বাবা! বাবা!

রাজা ॥

মা! মধুমালা! এই যে—এই যে আমি। চন্দনা, রাণীকে খবর দে, মধুমালার জ্ঞান ফিরেছে। মা মধুমালা! আমি মদনকুমারের খোঁজে দেশে দেশে লোক পাঠিয়েছি। যে তার খোঁজ এনে দিতে পারবে তাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দেবো। তোমার সোনার পুরীর সকল দুয়ার খুলে দিয়েছি। কোথাও আর কোনো প্রহরী নেই। সে যদি আসে কেউ তাকে বারণ করবে না। একটু চুপ ক'রে ঘুমোও মা লক্ষ্মী আমার।

মধুমালা ॥

বুঝলে বাবা সে ভারী দুষ্টু—ভারী চঞ্চল, এবার সে এলে আবার সোনার পুরীর সকল দুয়ার বন্ধ ক'রে দিও। যাওয়ার জায়গায় সাত হাজার প্রহরী বসিও। লোকের পাহারা নয় বাবা, চোখের পাহারা।

রাজা ॥

মা। দিনের মাঝে একবার ক'রে এমনি দুটো কথা বললে যে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তোর মুখের হাসি না দেখলে যে এই সন্দ্বীপের একটি ফুলও ফোটে না মালা।

মধুমালা ॥

ফুল আর ফুটবে কি ক'রে, বাবা। ফুলের দেবতা যে এসে চলে গেছেন, সেই অভিমানে ওরা ফুটছে না। আমার মতই সবাই চোখ বুজে আছে। সে এলে দেখবে সন্দ্বীপ হয়ে উঠেছে ফুলের রাজ্য।

চন্দনা ॥ (রাজাকে)

রাণীমা পূজায় বসেছেন—পূজা সেরে এখনি আসছেন। (মধুমালার দিকে ফিরিয়া) তোর লজ্জা করে না বাবার কাছে বরের কথা বলতে?

মধুমালা ॥ (বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া)

বারে। বাবার কথা বলতে মা ত লজ্জা করে না। আচ্ছা বাবা, তুমিই বল ত, বরের কথা যদি বাবা মা'কেই না বলব তবে কি অন্য গাঁয়ের লোক ডেকে বলব? আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি বাবা, সে এলে আমি এতটুকু লজ্জা করব না। তোমার সামনেই কথা বলব—রাগ করব, ঝগড়া করব—আচ্ছা বাবা, বর জিনিস্‌টে কি খুব লজ্জার?

রাজা ॥

হ্যাঁ মা, বর যদি বর্বর হয় তবে তার চেয়ে নারীর লজ্জার আর কিছু নেই। কিন্তু তোমাকে লজ্জা করতে হবে না মা, সে এলে আর যে যায় যাবে—আমি পালিয়ে যাব না।

মধুমালা ॥ (সলজ্জভাবে)

বাবা। এই পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর কোন্ দেশ বলতে পার?

রাজা ॥ (হাসিয়া)

কাঞ্চননগর, না? কিন্তু আমি বলব মা, যে দেশে আমার মা মধুমালা থাকে, তার চেয়ে সুন্দর দেশ ত্রিভুবনে নেই।

মধুমালা ॥

বাবা! কতদূর—কোথায় সেই কাঞ্চননগর? তার পথের ধূলিতে বুঝি সোনার রেণু ছড়ানো? তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ

বুঝি লজ্জা পায় তার কুমারের রূপে? কোথায় আমার সেই কাঞ্চননগর? কোথায় সেই কাঞ্চননগরের কুমার?

রাজা ॥

বহু সন্ধান ক'রে সে দেশের খোঁজ পেয়েছি মা। প্রাগ্-জ্যোতিষপুরের গারো পর্বতের কাছে সে দেশ। মহা রাজাধিরাজ দণ্ডধর সে দেশের অধিপতি। আমি তার কাছে দূত পাঠিয়েছি মা। মদনকুমার নামে যদি তাঁর কোনো পুত্র থাকে, তিনি নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে এখানে আসবেন। তিনি বাঙালী—আমিও বাঙালী, আমার মধুমালাকে নিশ্চয়ই বধূত্বে বরণ করবেন।

['বাবা' বলিয়া মধুমালা অশ্রুপূর্ণ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া সানন্দে বাবাকে জড়াইয়া ধরিল। পিতা সস্নেহে সাশ্রু নয়নে কন্যার পৃষ্ঠে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।)

মধুমালা ॥ (সহসা চমকিয়া উঠিয়া)

বাবা! বাবা! সে আসছে—আমার বুকের মাঝে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি—তার আগমনীর বাঁশী বেজে উঠছে আমার প্রাণে।

রাজা ॥

লক্ষ্মী মা আমার, অত উতলা হয়ো না।

মধুমালা ॥

চাঁদ ওঠে সে কোন্ দূর আকাশে, তবু পৃথিবীর সাগরের বুকে জাগে আনন্দ-জোয়ার, সে আর তখন কূলের বন্ধন মানে না। তরঙ্গের পাখা মেলে সে উড়ে যেতে চায় আকাশে। চাঁদ ওঠার খবর সাগর কি ক'রে পায়?

কোন্ আঁধার বনে ফোটে ফুল—ভ্রমর কেমন ক'রে জানতে পারে? আমার চাঁদ উঠেছে দূর-দিগন্তে, তাই ঝিলের জলের কুমুদিনীর মত আমার সারা অঙ্গে জেগেছে না-জানা আনন্দের আবেশ।—গোপিনীরা কি ক'রে শুনতে পেত কানুর বাঁশরী? আমি শুনেছি—শুনেছি আমার সুন্দরের বাঁশী। নদী যেমন শুনতে পায় সাগরের ডাক, তেমনি তার প্রতি পদক্ষেপে দুলে উঠছে আমার অন্তর। দেবতা জেগেছেন, তাই আমার অন্তর-দেউলের দুয়ার গেছে খুলে, বেদী উঠেছে দুলে। অরুণোদয় হয়েছে—তাই আমার ঘুমন্ত-ভাষা—প্রভাতের পাখীর মত মেতে উঠেছে কল-কণ্ঠে। ওগো আমার অনাগত শুভদিনের তরুণ অরুণ, তোমায় নমস্কার—নমস্কার। (বলিতে বলিতে মূর্ছা)

রাজা॥

চন্দনা, শীগ্গীর রাণীকে খবর দে, মা বুঝি আবার জ্ঞান হারাল। (ব্যস্তসমস্ত হয়ে মধুমালাকে জড়াইয়া ধরিলেন)

[মেঘনার ও পদ্মার মুখে মদনকুমারের সপ্তডিঙা মধুকর ভেসে চলেছে—মাঝিদের গান]

(ওরে ও) পদ্মা নদী বলতে পারিস কোথায় মধুমালা?
সাগর-ঘেরা সোনার পুরী কাঁদে রাজ-বালা
কোথায় মধুমালা?
(তার) গলায় দোলে রাজপুত্রের গলার পদ্মমণি,
চাঁদের মুখে একটুখানি তাহারি লাবণী
পাথার-জলে পা ডুবিয়ে কাঁদে সে নিরালা
কোথায় মধুমালা॥

অয়স্কান্ত ॥

একে মনসা তাতে আবার তোরা ধুনোর গন্ধ দিসনে বাবা। তার চেয়ে গা না—

গান

বোন রে বোন এ কোন্ রূপ দেখালি,
যেন হাঁড়ি মাথায় বেরাণী হোগলা বনের শেয়ালী ॥
তাম্বুরা প্রায় পেটরে তাহার জাম্বুরা প্রায় গাল
(তার) চিকন গায়ের ছাল যেন খাজা কাঁঠাল ॥
গাঁদালপাতার মালা গলায় দাঁড়িয়েছিল শ্যাওড়াতলায়
অঙ্গ দেখি ঘেঁটু ফুল ভরালী ॥

একজন মাঝি ॥

কর্তা! আপনার কথা শুইন্যা শুইন্যা প্যাটের বাঁধন ছিঁইর‍্যা গেলগিয়া, আপনি এ্যাহন ক্ষেমা দেন, এত হাসলে দাঁড় টানার জোর পাইমু না।

মদনকুমার ॥

ঐ—ঐ—কালো মেঘের এলো কেশ দুলিয়ে সে আসছে। ঐ—ঐ তার ধূলায় ধূসর চন্দন-রং উত্তরীয়। আকাশে ঝড় উঠিয়ে সে আসে। আমার শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

মাঝি ॥

হয় হয় হাচাই ত। ওরে, ঈশান কোণে মেঘ উঠছে রে, নৌকা তীরে লও—তীরে লও। আর যদি তীরে যাওনের আগে তুফান আইস্যা পড়ে—তাইলে সাবধান।

হাল খুব শক্ত কইর‍্যা ধইর‍্যা বইস্যা রইবি—খবরদার হুঁশিয়ার।

অয়স্কান্ত॥ (ছুটোছুটি করিতেছে)

আর খবরদার। ততক্ষণে ঝড় যে এসে পড়ল।

রুদ্রকুমার॥

সেনা-সামন্ত মাঝিমাল্লা সব হুঁশিয়ার! প্রাণপণে হাল ধরে থাকবে। নৌকা তীরে নেবার চেষ্টা করো না। তুফান এসে পড়েছে। (ভীষণ ঝড় বৃষ্টি তুফান সাইক্লোন—মাঝি-মাল্লার সেনা-সামন্তের কলরোল। সাইক্লোনের বেগে বিপুল আর্ত কোলাহলের মধ্যে সপ্তডিঙা ডুবিয়া যাইতে লাগিল)

মদনকুমার॥ (উদ্‌ভ্রান্তের মত)

আসে আসে আমার সুন্দর রুদ্রের রূপে আসে। ঐ বিজলি শিখায় তার সোনার কাঁকনের ঝিলিক। ধূলি-গৈরিক গগন কোণে দোলে তার চন্দন-রং উত্তরীয়। পুঞ্জিত কালো মেঘে তার কেশভার। ঝঞ্ঝার রাতে অসীম বিরহের আর্ত রোদনধ্বনি আমি শুনছি। মরণের মাঝে তোমার আহ্বান আমি শুনেছি মধুমালা—মধুমালা। (জলে ঝম্প প্রদান)

[পার্বত্য চট্টগ্রাম বা মগ রাজ্যের প্রমোদভবন। সপরিষদ মগরাজ সুরা পানে রত]

মগরাজ॥ (সুরাপান করিতে করিতে)

আমার এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালী মগের মুল্লুক নাম দিয়েছে না, মন্ত্রী? তার চরম প্রতিশোধ আমি কি ক'রে নেব জান?

মন্ত্রী ॥

বাঙলার জলে স্থলে আমরা যে বিভিষিকার সৃষ্টি করেছি তারও অধিক শাস্তি আমি ত কল্পনা করতে পারি না মহারাজ।

মগরাজ ॥

পারবে কেমন ক'রে ? তা হলে ত তুমিই রাজা হতে, আমি হতাম তোমার আদেশ পালনের মন্ত্রী।

মন্ত্রী ॥

মহারাজ, আমার কর্তব্য মন্ত্রণা দেওয়া, আদেশ পালনের কর্তব্য সেনাপতির।

মগরাজ ॥

ঐ—যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। যাক, কী শাস্তির কথা বলছিলাম জান ? আমার ঐ কুৎসিত কুব্জপৃষ্ঠ আকাট মূর্খ পুত্রের সঙ্গে বাঙলার শ্রেষ্ঠ রাজ-কন্যার বিবাহ দেবো।

মন্ত্রী ॥

ঐ ছেলেকে দেখে স্বেচ্ছায় কোনো রাজা কেন প্রজাও কন্যা দান করবে না। তবে যদি জোর ক'রে কেড়ে আনেন সে কথা স্বতন্ত্র।

মগরাজ ॥

জোর ক'রে নয় মন্ত্রী। বলে নয় ছলে আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবো। আমি ক্ষত্রিয়—কাজেই বাঙালী ক্ষত্রিয় কোনো রাজার আমার পুত্রকে কন্যা দিতে বাধবে না।

মন্ত্রী ॥

তা জানি মহারাজ। বাধবে শুধু আপনার পুত্রের কুঁজে।

মগরাজ ॥

আমি খুঁজে খুঁজে সে কুঁজের ওষুধ বার করেছি। সেনাপতি!

সেনাপতি ॥

মহারাজের আদেশ!

মগরাজ ॥

কাল যাকে নদী তীরের বালুচরে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে তাকে এখানে আন।

(বন্দী অবস্থায় মদনকুমারের প্রবেশ)

মন্ত্রী ॥

এ কি! এ সোনার চাঁদকে কোন্ আকাশে জাল পেতে ধরলেন মহারাজ?

মগরাজ ॥

বুদ্ধির জাল পাত্‌তে জানলে চন্দ্র কেন, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সকলকেই ধরা যায় মন্ত্রী—এ ত দুধের ছেলে। সেনাপতি! ওর বন্ধন মুক্ত ক'রে দাও। যুবক! তুমি ঐ আসন গ্রহণ কর। তুমি পথ-শ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত, খানিক নৃত্য গীতের বাতাস লাগিয়ে চিত্তকে সুস্থ কর। সেনাপতি! ডাকো মণিপুরী নর্তকীদের। তোমার পান-টান চলে ত হে ছোকরা? দেখে ত রাজার পুত্র—অন্ততঃ সওদাগরের পুত্র বলেই মনে হয়।

মদনকুমার ॥

মহারাজ! আমায় মার্জনা করুন। আমি নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান এসব কখনও খাই নি।

মগরাজ ॥

বল কি হে? যেদিন তোমায় সমুদ্র থেকে তুলেছিল সৈনিকবৃন্দ, সেদিন নাকি তোমার পেট থেকে আধ-সমুদ্দুর জল বের করেছিল। আচ্ছা বাবা, সত্যি বলত, অগস্ত্য মুনি কি তোমার মামা-টামা কেউ হতেন?

(নর্তকীদল লইয়া সেনাপতির প্রবেশ)

আচ্ছা, তোমার টিকুজি কুষ্ঠি পরে দেখব, এখন গান শোন। কিন্তু সাদা চোখে কি নাচ গান ভাল লাগবে বাবা? অঃ! ভুলে গেছি—তোমার মুখে যে এখনও মাতৃস্তন্যের গন্ধ লেগে রয়েছে—তুমি এ রসের স্বাদ গ্রহণ করবে কি ক'রে? নাচো বাছা—তোমরা নাচো।

মণিপুরী নৃত্য ও গান

আমরা বনের পাখী বনের দেশে থাকি।
ফিরি পাহাড়ী ফুলের রাঙা পরাগ মাখি॥
মোরা ঝর্ণা-ধারে ঐ নীল পাহাড়ে—
দেবদারুর শাখায় বাঁধি লতান রাখী॥
শুনি বন উদাসী মিঠে পাহাড়ী বাঁশি
মোরা শিস দিয়ে রাখাল ছেলেরে ডাকি॥

মগরাজ ॥

চমৎকার! সুন্দর! সেনাপতি! তোমার আর মন্ত্রীর সাথে আমার কিছু গুপ্ত মন্ত্রণা আছে—আমি চাই এখানে

আমরা তিনজন আর ঐ যুবক ছাড়া আর কেউ না থাকে।
(সেনাপতির ইঙ্গিতে মন্ত্রী ছাড়া আর সকলে অভিবাদন করিয়া উঠিয়া গেল)

মগরাজ ॥

শোন মন্ত্রী। আমি গৌড়েশ্বরের লোককে এই ছেলেটিকে দেখিয়ে আমার ছেলে বলে পরিচয় দেবো। ওরা আমার আমন্ত্রণে পাত্র দেখতে এসেছে। (মদনকুমার চমকিয়া উঠিল) কি হে যুবক! তুমি অমন ক'রে চমকে উঠলে যে! তোমায় মারবও না ধরবও না। দিব্যি বঙ্গেশ্বরের জামাই বাবাজী হবে ঘণ্টা কয়েকের জন্য। তার পর ব্যস ছুটি! ওরা তোমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলবে—আমার পিতা রাজাধিরাজ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিশ্বর শ্রীল শ্রীচক্র সেন, বুঝলে?

মদনকুমার ॥

যদি না বলি!

মগরাজ ॥

'না' বললে কারাগারে পাঠিয়ে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। কিন্তু কেন 'না' বলবে হে নির্বোধ যুবক? তোমার মত পথের ভিখারীর এক মুহূর্তের জন্যও রাজপুত্র হওয়া কি কম কথা? ব্যস, এক পক্ষের মধ্যে বিবাহের দিন স্থির হয়ে যাবে। তুমি বর সেজে বাসরঘরে ঢুকেই বেরিয়ে পড়বে। তার পর যা করার আমি করব।

মন্ত্রী ॥

মহারাজ! কিন্তু বাসরঘরে আপনার কুৎসিত কুব্জ পুত্রকে দেখে যখন রাজকন্যা চীৎকার ক'রে উঠবে, তখন?

মগরাজ ॥

তারও উপায় ঠিক ক'রে রেখেছি—কি বল সেনাপতি ?

মদনকুমার ॥

কিন্তু মহারাজ আমার মধুমালা—মধুমালার কি হবে ?

মগরাজ ॥

আরে মধুমালা নয়, মধুমালা নয়, কন্যার নাম কাঞ্চনমালা।

(চিত্রসেন রাজার পুত্র বিচিত্রকুমারের প্রবেশ। কুব্জ পৃষ্ঠ, নাক মোটা—তোত্‌লা—হাবা—অতি কুৎসিত)

বিচিত্রকুমার ॥

বাবা! আমার নাকি ইয়ে ইয়ে বিয়ে! আমি বৌ বৌ বৌ দেখ্‌ব,—বৌএর কোলে মেনি বেরালটির মত চুপটি ক'রে শুয়ে থাকব। এ সু সু সুন্দরী কে ? (মদনকুমারের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল)

মগরাজ ॥

বেরো—বেরো আমার সামনে থেকে বলছি—ব্যাটা হাবার ডিম, অকালকুষ্মাণ্ড, কুমড়ো, পটল! আরাকান কুলের কলঙ্ক—ব্যাটার চেহারায় আমার রাজ্য উজ্জ্বল হয়ে গেল! খবরদার! এ দু'দিনের মধ্যে যদি বাড়ীর বের হয়েছিস ত মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।

বিচিত্রকুমার ॥ (ক্রন্দনের সুরে)

ওমা—মাগো—আমায় মেরে ফেল্‌লে গো—তোমার বি—বি—বিচিত্র কুমড়োকে বাবা কেটে ফেললে গো! মা বললে তোর বিয়ে—টুক—টুক—টুকটুকে—বৌ—বৌ—বৌ আসবে! বাঙ—বাঙ—বাঙলার রাজার লোক এসেছে—

আমি তাদের বলে এলুম—আমি তোমাদের কনের বর। তারা শুনে বোঁচকা প্যাঁট্রা বেঁধে রওয়ানা দিচ্ছে তাই বলতে এলুম—আর আমায় কিনা ধমক দেওয়া!

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

মগরাজ ॥

এই হয়েছে! সেনাপতি! তুমি এখনই যাও—তাঁদের ফেরাও—বল গিয়ে ও রাজবাড়ীর চাকরের ছেলে—হাবা নির্বোধ। ও নিজেকে রাজার ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। আর মন্ত্রী—মন্ত্রী তুমি তাড়াতাড়ি এই ছেলেটিকে রাজবেশ পরিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে নাও! যাও—যাও দেরি করো না, ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে।

রাণী বৃশ্চিকা ॥

বলি, কে চাকরের ছেলে? (রাণীর পশ্চাতে বিচিত্রকুমার কাঁদিতে ছিল আঁখি ধরিয়া) লজ্জা করে না নিজের ছেলেকে চাকরের ছেলে বলে পরিচয় দিতে? অঃ, পেটপুরে গেলা হয়েছে বুঝি? তা নইলে এমন জ্ঞানের কথা মুখ দিয়ে বেরোয়! (ততক্ষণে মগরাজের নেশা প্রায় ছুটিয়া গিয়াছে)

বিচিত্রকুমার ॥

ওগো মা গো! আমি—আমি চাকরের ছেলে হব না গো—আমি আমার বাবার ছেলে মা গো!

রাণী বৃশ্চিকা ॥

হ্যাঁ, তুই যদি চাকরেরই ছেলে হ'স, তাহলে তোর মা'র ঐ পা-টেপা চাকরের ছেলে। (রাজাকে দেখাইল) বলি,

নিজের চেহারাখানা একবার আয়না দিয়ে দেখেছ? আয়না ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করবে যে! ঐ চেহারায় শুয়োর না হয়ে এই ছেলে যে হয়েছে এই আমার বাবার ভাগ্যি!

মগরাজ ॥

আঃ! রাণী কর কি? কর কি? ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে—দেখলে কি বলবে বলত? আমি ত তোমার ছেলের ভালর জন্যই এ ব্যবস্থা করেছি—দেখত ঐ কোণের ছেলেটিকে—ওটিকে তোমার ছেলে বলে কোলে নিতে ইচ্ছা করে না? এখন ওকেই দেখাব তার পর বিয়ে চুকে গেলে ও চলে যাবে।

রাণী বৃশ্চিকা ॥

আহা আহা! এ কার ঘরের মাণিক গো? কার ঘর আঁধার ক'রে ওকে চুরি ক'রে এনেছ?

মগরাজ ॥

চুরি ক'রে আনি নি—ও সাগরের জলে ভেসে এসেছে। সমুদ্রের বালুচরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। আমার সৈন্যরা দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

রাণী বৃশ্চিকা ॥ (কাছে গিয়া)

তোমার দেশ কোথায় বাবা? তোমার নাম কি? তোমার মা নিশ্চয়ই রাজরাণী—নইলে এমন ছেলে পেটে ধরে?

মদনকুমার ॥ (প্রণাম করিয়া)

কে তুমি মা এমন ক'রে ডাকলে? তোমার কণ্ঠস্বরে আমার মা'র কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। কতদিন হ'ল তাঁকে হারিয়েছি।

আমার মা রাজরাণী নয় মা, পথের কাঙালিনী। দারিদ্র্যের তাড়নায় এক বণিকের দাস হয়ে বাণিজ্যে বেরিয়েছিলাম। পথে তুফানে আমাদের জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম আমি এই রাজপুরীতে বন্দী। কিন্তু মা—আমার মধুমালার পথ যে হারিয়ে গেল।

মগরাজ ॥

ঐ—ঐ দেখ আবার পাগ্‌লামি আরম্ভ হ'ল। বেশ থাকে, হঠাৎ মাঝে মাঝে মধুমালা মধুমালা ক'রে কেঁদে ওঠে। মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে।

রাণী বৃশ্চিকা ॥

তুমি থাম। জাহাজ ডুবির সময় তক্তায়-টক্তায় বাছার মাথায় হয়ত লেগেছে। বাবা! চল, তুমি আমার ঘরে শোবে চল! খেয়ে খানিক ঘুমুলে সব ভুলে যাবে দেখে নিও।

বিচিত্রকুমার ॥

ওগো মা গো! ঐ স্মুমুন্দীকে নিয়ে এই চাঁদপানা ছেলেকে ফেলে শুয়ো না গো। মাগো! আমি তোমার কাছে ঘুমুব গো! আমার—আমার বৌকে কি তাহলে ঐ স্মুমুন্দী বিয়ে করবে নাকি? মা গো—আমার মা—মা—মা—মালঞ্চমালা গো!

রাণী বৃশ্চিকা ॥

আঃ! কাঁদিস নে খোকা! এ তোর ছোট ভাই, ভাইকে কি ওসব গালমন্দ দিতে আছে? এক মায়ের কি দুই ছেলে থাকে না? (মদনকুমারের মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া চুমু খাইলেন)

বিচিত্রকুমার ॥

ভাই না ছাই—ঐ সুমুন্দীকে ভাই বলতে যাব কোন্ ছুঃখে ? আমি যে এতদিন একলা মায়ের একলা পুত ছিলাম। এ শালা ডোক্না কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল রে— ওরে আমার মালঞ্চমালা—মা—মা—মালারে—

(প্রস্থান)

[বঙ্গেশ্বরের রাজভবনে বাসরঘরে মদনকুমার ও কাঞ্চনমালা পাশাপাশি বসিয়া। পুরনারীদল ঘিরিয়া বসিয়াছে। বাহিরে রোশন-চৌকী ও সানাই ইত্যাদির মধুর বাদ্য শোনা যাইতেছে]

একজন পুরমহিলা ॥

আহা ! কি রূপ, এক চাঁদ যেন ছু'খণ্ড হয়ে নেমে এসেছে।

অন্য একজন মহিলা ॥

কিন্তু যাই বল দিদি, বরের পাশে কনে যেন চাঁদের পাশে তারার মত মিটমিট করছে। সত্যি কথা বলব তার আবার ভয় কি ?

(কাঞ্চনমালা হাসিয়া বরের আঙুল মটকাইয়া দিল)

মদনকুমার ॥ (বিরস বদনে বসিয়াছিল—তাহার মন চোখ যেন কোন্ দূরে চলিয়া গিয়াছে। আঙুল মটকাইতে কনের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল)

উঃ ! (আঙুলে হাত বুলাইতে লাগিল)

জনৈক সখি ॥

কি লো, এখন থেকেই শাসন করছিস ? একটু দেখি না ভাই, তার পর ত থাকবিই ছু'জনে সারা রাত—এত উতলা হ'স নে—তোর বরকে কেউ কেড়ে নেবে না।

অন্য একজন ॥ (মুখ ফিরাইয়া)

ঐ যে বলে, যে ধনী ধন পায়, দিনে দেখে তারা,—

আর একজন পুরমহিলা ॥

ওলো, মহারাজকে বলে যে এই নাচুনীদের আনলি,—তা দু'-একটা গান শুনবি, নাচ দেখবি না বরের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে ওকে গিলে খাবি? মা গো মা, দেখছে না ত যেন চোখ দিয়ে গিলছে! গাও গো বাছারা—বরকনেকে ঘিরে দুটো গান গাও, শুনে চলে যাই। আমাদের উনি আবার হা পিত্যেশ ক'রে পথ চেয়ে বসে আছেন।

নর্তকীদের গান ও নাচ

মধুর মধুর! আজি সকলি মধুর!
মধুর মালা গলে মধুর বঁধুর ॥

মদনকুমার ॥

ও নাম তোমরা কার কাছে শুনলে? মধুমালা—মধুমালা ও নাম তোমাদের কে শেখাল?

(নর্তকীরা হাসিয়া নাচিতে লাগিল)

জনৈক মহিলা ॥

ওমা জামাইএর মাথায় ছিট আছে নাকি লা?

জনৈক কিশোরী ॥

মাসি! পালাও পালাও—কামড়ে দেবে।

জনৈক মহিলা ॥

আমরা তোদের চক্ষুশূল হয়েছি, না লা? বলি তোতে আমাতে বয়সের তফাত কত যে, ওকথা বলছিস্?

অন্য একজন পুরস্ত্রী ॥

আঃ! তোমরা গান শুনতে দেবে—না এমনি কচ্‌কচি করবে?

নর্তকীদের গান

মধুর চাঁদের পাশে মধুর রোহিণী হাসে
মধুর ফুলের মুখে মধু ভরপুর ॥
মধুর মিলন রাতি মধুর জাগায় সাথী
মধুরতর হ'ল মধুরতর ওলো
কাছে এসে বিধুর সুদূর।

জনৈক মহিলা ॥

ওলো, বরের চোখমুখ যেন ক্রমেই কেমন হয়ে উঠছে! তোমরা কিছু মনে করো না বাছারা, ওদের একটু একলা থাকতে দাও। (উলু দিতে দিতে সকলের প্রস্থান। হু' একটি ফাজিল মেয়ে উলুধ্বনির সাথে চীৎকার করিয়া উঠিল "ভল্লু ভল্লু ভল্লু।")

একটি মেয়ে ॥ (কান ধরিয়া)

ওর নাম মধুমালা নয় কাঞ্চনমালা—মনে—রেখো, বুঝলে? এই কান ধরে ভাল করে কানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলুম!

(সকলের হাস্য)

মদনকুমার ॥ (কাঞ্চনমালার দিকে চাহিয়া কানে হাত বুলাইতে বুলাইতে)

ওটি বোধ হয় তোমার কোনো সম্পর্কের বোন—ওর হাতের চেটো ত নয় কেটো! রাজবাড়ীর মেয়ের হাত এমন হাতার মত হয়—এ আমার জানা ছিল না।

কাঞ্চনমালা ॥

দাঁড়াও আমি আগে প্রণাম সেরে নিই। (মদনকুমারকে হাত ধরিয়া উঠাইল। বাহির হইতে একজন মেয়ে বলিয়া উঠিল— "ওলো দোরে ভাল ক'রে খিল দে, পালঙ্কের নিচে কেউ লুকিয়ে আছে কি না দেখে নিস। জানালাগুলি বন্ধ ক'রে দে—সব দেখতে পাচ্ছি যে!")

কাঞ্চনমালা ॥

একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

মদনকুমার ॥

বল।

কাঞ্চনমালা ॥

মধুমালা কে ?

মদনকুমার ॥

তোমায় সব বলছি শোন। আমি আরাকানের রাজকুমার নই—আমার নামও বিচিত্রকুমার নয়।

কাঞ্চনমালা ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

তাহলে তুমি কে ?

মদনকুমার ॥

ব'স—স্থির হয়ে শোন—আমার বেশী সময় নেই—আমাকে এখনি চলে যেতে হবে—হ্যাঁ, আমাকে যেতেই হবে সেই মধুমালার সন্ধানে। হয়ত আর কখনও আমাদের দেখা হবে না। আমি—আমি তোমার স্বামী নই—তোমার স্বামী যে সে এখনি আসবে—অতি কুৎসিত তার চেহারা—তবু সেই তোমার স্বামী।

কাঞ্চনমালা ॥

ওগো! তুমি অমন কথা বলো না। আমার বুক কাঁপছে। আমাকে ধর—আমার মাথা কেমন করছে (মদনকুমার তাড়াতাড়ি বুকে ধরিলেন) আঃ। স্বামী। আমি যে নারায়ণ শিলা স্পর্শ ক'রে তোমাকেই স্বামী বলে বরণ করেছি—শুভদৃষ্টির ক্ষণে তোমারই ঐ সুন্দর মুখ দেখেছি। কুৎসিত হোক সুন্দর হোক—এই ত্রিভুবনে আমার স্বামী আর কেউ নেই, হবে না, হতে পারে না।

মদনকুমার ॥

শোন তবে আমার সত্য পরিচয়। আমার নাম মদনকুমার। আমি কাঞ্চননগরের যুবরাজ।

কাঞ্চনমালা ॥

তুমি! তুমি সেই সুন্দর—তোমার রূপের খ্যাতি যে আজ বাঙলার ঘরে ঘরে—মুখে মুখে। তোমার বাবা যে আমার বাবার বিশেষ বন্ধু। আমি যাই, বাবা মাকে বলে আসি।

মদনকুমার ॥ (হাত ধরিয়া)

না, তা হতে পারে না। শোন, তুমি হয়ত আমার সব কথাই শুনেছ। আমি মধুমালার সন্ধানে বেরিয়েছিলাম সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে। পথে জাহাজ ডুবি হয়ে আমার সেনাসামন্ত সকলে মারা যায়। আমার যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলাম আমি মগরাজের রাজপুরীতে বন্দী। মগ-রাজপুত্র অতি কুৎসিত বলে রাজা আমাকে দেখিয়ে তোমার সাথে তাঁর পুত্রের সম্বন্ধ ঠিক করেন। তাঁর সঙ্গে আমার এই শর্ত যে বাসরঘরে ঢুকেই

আমি বেরিয়ে পড়ব—তিনি তাঁর সেনা দিয়ে আমাকে মধুমালার দেশে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি, এখন তোমার কর্তব্য তুমি ঠিক ক'রে নিও। ভগবান তোমাকে কুৎসিতের হাত থেকে রক্ষা করুন।

(সহসা দ্বার খুলিয়া প্রস্থান। কাঞ্চনমালা অতি করুণ স্বরে আর্তনাদ করিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল। অমনি সেই মুক্ত দ্বার দিয়া বিচিত্রকুমার প্রবেশ করিল)

বিচিত্রকুমার ॥ (উল্লাসে বুক চাপড়াইয়া—চুল ছিঁড়িয়া)

ওরে বাপরে, আমি কোথায় বাপরে। রূপ দেখে যে মাথা ঘুরে যায় রে বাবা। বাবা মামা। একটু হুঁশ রেখো বাবা। এ যে রূপের পাহাড় রে বাবা। কা—কা—কা—কাঞ্চন মা—মা—মা—লা। আমি এসেছি—আমি তোমার বরটি—তোমার সোয়ামী—তোমার কোলের মেনি বেরালটি।

কাঞ্চনমালা ॥ (জাগিয়া উঠিয়া)

কে? কে তুমি কুৎসিত! যাও, দূর হও এখনি আমার সামনে থেকে—নইলে (তরবারি লইয়া) তোমায়—তোমায় আমি হত্যা—হত্যা করব—যাও—পালাও—পালাও।

[বাহিরে বহু স্ত্রীকণ্ঠের শব্দ, ওগো, রাণী মাগো শীগগীর ছুটে এস—কাঞ্চনমালা তার বরকে কেটে ফেললে গো]

(দোর খুলিয়া রাণীর প্রবেশ)

রাণী ॥

কাঞ্চন! কাঞ্চন! (তরবারি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন)

[বিচিত্রকুমার ততক্ষণে পালঙ্কের নীচে লুকাইয়া পড়িয়া পালাইবার ফাঁও খুঁজিতেছে]

রাণী ॥

ছিঃ ছিঃ। তুই আমাদের কুলে কলঙ্ক দিলি। কলঙ্কিনী! কি ক'রে তুই বাসরঘরে বিয়ের রাতে অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে কাটতে গেলি! পোড়ার মুখী, অমন কার্তিকের মত ছেলেকে দেখেও তোর মন উঠল না? আমি কি ক'রে এ পোড়ার মুখ লোককে দেখাব? কই, আমার সোনার চাঁদ কোথায় গেল?

কাঞ্চনমালা ॥ (কাঁদিয়া ফেলিয়া)

মা! সে চলে গেল—চলে গেল! আমি যাকে কাটতে গিয়েছিলাম সে তোমার জামাই নয়।

রাণী ॥

কে—কে তবে এল এ-ঘরে?

কাঞ্চনমালা ॥ (পালঙ্কের নীচে বিচিত্রকুমারকে দেখাইয়া)

ঐ দেখ, ঐ নির্বোধ কুৎসিতকে কাটতে গিয়েছিলাম। মগরাজের প্রতারণার কথা তোমাকে সব বলছি—কিন্তু তার আগে ওকে বের ক'রে দাও এখান থেকে।

রাণী ॥

উঃ! মাগো! এ হনুমান কোত্থেকে এখানে এল? পাঁড়ে! চৌবে! দৌবারিক!

(সকলে আসিয়া হাজির হইল)

রাণী ॥

এই হনুমানের কান ধরে মারতে মারতে রাজার কাছে নিয়ে

যাও—তাঁকে বলো, দিদিমণির ঘরে এই চোর চুরি করতে ঢুকেছিল।

[পাঁড়েজি চৌবেজি ইত্যাদির বিচিত্রকুমারকে প্রহার ও গালি বর্ষণ—চল্‌রে শালা চোট্টা, চল্‌ চল্‌]

বিচিত্রকুমার ॥

আমি চোর না, চোর—তোমাদের রাজকন্যার মনোচোর—তোমাদের রাজার জামাই—জা—জা—জা—মাই! ওগো মাগো, মেরে ফেললে গো!

চৌবেজি ॥

জামাই—জামাই! তব্‌ চল না সবেরসে ঘানি টানবে—চল্‌ চল্‌।

(গৌড়েশ্বরের রাজপুরী—রাজা সেনাপতি মন্ত্রী ইত্যাদি)

রাজা ॥

শঠ! প্রতারক! মগের মুল্লুকের রাজা কি না পাজীর পা ঝাড়া। বলে যুদ্ধ করব—ঐ হনুমানের হাতে আমার মেয়েকে দিতে হবে?

সেনাপতি ॥

মহারাজ। ওরা রাজপুরীর তোরণ-দ্বার আক্রমণ করেছে। আদেশ দিন, ওদের মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আসছি—সাগর পারের হনুমানকে সাগর পারে রেখে আসি।

মন্ত্রী ॥

কিন্তু এত বিপুল সৈন্য এল কোত্থেকে? গঙ্গার বক্ষ তার সহস্র রণ-তরী ছেয়ে ফেলেছে।

রাজা॥

দুর্দণ্ড কি এর জন্য প্রস্তুত না হয়ে এসেছে মনে কর মন্ত্রী? এতদিন বাংলার ভাণ্ডার লুটে যে পাপ সঞ্চয় করেছে আজ তার শাস্তি দেবো—সমুচিত শাস্তি দেবো। যাও সেনাপতি, যুদ্ধ করো—আমিও আসছি। মন্ত্রী, তুমি কুলললনাদের রক্ষা করো—যদি মগ জয়ী হয়—ওদের গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিও। আমি চললাম—

(বাহিরে ভীষণ যুদ্ধের শব্দ)

(রক্তাক্ত কলেবরে রাজার প্রবেশ)

পালিয়েছে। ভীরু পালিয়েছে গঙ্গার পথে। সাগর পারের হনুমান সাগর-পারে পালিয়েছে। (বসিয়া পড়িয়া) মা—মা কাঞ্চনমালা, কই, আমার কাঞ্চনমালা কই—আমার সোনার চাঁদ মদনকুমার কই? (মূর্ছা)

[পার্বত্য অরণ্য পথ—বীর বেশধারী রাজার পুত্র মদনকুমার পথে চলিয়াছে]

গান

ও বন-পথ! ওরে নদী কোথায় রে তোর শেষ?
সেই শেষে কি আছে আমার মধুমালার
দেশরে, মধুমালার দেশ॥
পাহাড় রে তোর কাল কোলে
সাগর ঢেউ-এর মালা দোলে
সেই সাগরের তীরে বসে শুকায় কি তার কেশ
সে শুকায় কি তার কেশ॥

ওরে আকাশ তুই কি নুয়ে
মধুমালায় আসছিস ছুঁয়ে
(দেখি) রঙীন সাঁঝে তোরই মাঝে (তার) পা'র
আলতার রেশরে মধুমালার দেশ ॥

(গাহিতে গাহিতে মদনকুমার দূরে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ময়ূর-বিমানে চড়িয়া ঘুমপরী ও স্বপনপরী নামিয়া আসিল)

ঘুমপরী ॥

স্বপ্নদি। আর ওর এ আর্তি দেখতে পারিনে—ওর কান্না শুনে পাষাণ গলে আকাশ টলে সাগর দুলে ওঠে। ফুল ঝরে যায়, বনের পাখী গান ভুলে যায়। চল, ওকে মধুমালার দেশে রেখে আসি।

স্বপনপরী ॥

কি লো, বুক যে টনটন ক'রে উঠল। কিন্তু তুই ত হেরে আছিস। ও এখন আমার।

ঘুমপরী ॥

কখ্খনো না, মধুমালার চেয়েও অনেক সুন্দর।

স্বপনপরী ॥

তা ত এখন বলবিই। আচ্ছা, ঝগড়া করবার সময় পরে পাব—ঐ দেখ, বেচারা পাহাড়ী-পথ থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। যা, ছুটে গিয়ে বুকে ধর—

(ঘুমপরী ছুটিয়া গিয়া রাজপুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার পরে অচেতন রাজকুমারকে ময়ূর-বিমানে লইয়া আসিল। দুই পরী আকাশে গান গাহিতে গাহিতে উধাও হইয়া গেল)

ফুলেল হাওয়া যারে ছুটে মধুমালার দেশ।
যোগিনীরে পরতে বলিস নব বধূর বেশ ॥
সোনার ঘটে রাখতে বলিস আকুল চোখের জল
সেই জলেরে ধোওয়াবে সে বঁধুর পদতল
বলিস তারে পা মুছিয়ে বাঁধে যেন কেশ
যেন বাঁধে আকুল কেশ ॥

[গৌড়েশ্বরের প্রাসাদ—সন্ধ্যা। কাঞ্চনমালা তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিল। তার পর দূরে সন্ধ্যাতারার দিকে চাহিয়া গাহিতে লাগিল]

গান

তুমি হেসে চলে গেলে বন্ধু তোমার কাঁটার পথে।
কাঁদতে আমায় রেখে গেলে একলা ফুলের রথে ॥
ও পথের বন্ধু! তোমার পথে যদি নিয়ে যেতে
পথের কাঁটা ঢেকে দিতাম আমার এ বুক পেতে
আজ সুখের রথে কাঁদি বন্ধু দুখের সাথী হতে
তোমার দুখের সাথী হতে ॥

কাঞ্চনমালার মাতা ॥
তুলসী তলায় ভর-সন্ধ্যায় কে কাঁদেরে ?

কাঞ্চনমালা ॥
কাঁদছি কোথায় মা! আমি ত গুনগুন ক'রে গান করছি।

(বলিতে বলিতে কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়া তুলসীতলায় লুটাইয়া পড়িল)

কাঞ্চনমালার মাতা ॥ (কাঞ্চনের মাথা কোলে লইয়া তাহার এলো চুলে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। আত্মসম্বরণ করিয়া ধরা গলায় বলিলেন) তোর চোখ দিয়ে যে দিন রাত গঙ্গা-যমুনার ধারা বয়ে যাচ্ছে মা। দিন রাত কেঁদে কেঁদে কি চেহারা হয়েছে একবার আরশির কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিস? লক্ষ্মী মা আমার, ওঠ, ভর সন্ধ্যায় কাঁদলে বাছার অমঙ্গল হবে। দেশে দেশে লোক ছুটেছে তাকে খুঁজতে। তোর বাবার লোক তন্ন তন্ন ক'রে তাকে খুঁজছে। বন-জঙ্গল পাহাড় জলপথ স্থলপথ চারিদিকে সজাগ পাহারা। সে পালাবে কোথায়—এই সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় বসে বলছি—তাকে তুই আবার পাবি।

কাঞ্চনমালা ॥

আচ্ছা মা, বিয়ের রাতে বরকে হারিয়েছে—এমন আর-একটি অভাগিনী তুমি এই বাংলাদেশে দেখেছ? আমি যদি তার মধুমালার মত সুন্দর হতাম সে কখ্খনো এমন ক'রে ফেলে যেতে পারত না। মাগো, এবার যদি মরি, আশীর্বাদ করো আর জন্মে যেন তার মনের মত হই।

কাঞ্চনমালার মাতা ॥

তুইও ক্ষেপলি নাকি কাঞ্চন? কোথায় মধুমালা? ও নামের কোনো মেয়ে কোথাও আছে নাকি? স্বপ্নের কথা কখনও সত্যি হয়? যেমন পাগল জামাই তেমনি পাগলা মেয়ে।

কাঞ্চনমালা ॥

পাগল জামাই, পাগল মেয়ে। কিন্তু পাগল শিব ত

কোনোদিন গৌরীকে তাঁর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেন নি। শিব ভিক্ষা মেগেছেন পার্বতী তাঁর ভিক্ষের ঝুলি বয়ে নিয়ে গেছেন। আমায় কেন উনি তেমনি ক'রে পথের কাঙালিনী ক'রে সাথে ডেকে নিলেন না? আমি চাইনে—চাইনে এ রাজভোগ। কে চায় এ রাজপ্রাসাদে থাকতে! সীতার মত কেন তাঁর সাথে যেতে পারলাম না।

(মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

গৌড়েশ্বর ॥ (কান্না ও আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে)

রাণী! রাণী! কোথায় তুমি। আমার মা কাঞ্চন কোথায়? শীগগীর ছুটে এস, আমার বেয়াই বেয়ান এসেছেন—আমার বেয়াই বেয়ান কাঞ্চননগরের রাজা রাণী—কাঞ্চনের শ্বশুর-শাশুড়ী।

(মাতা ও কন্যা তীর বেগে উঠিয়া পড়িলেন। কাঞ্চন তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল)

গৌড়েশ্বর ॥

এই যে বেয়াই! বেয়ান ঠাকরুণ! এদিকে—এদিকে—ঐ তুলসীতলায় মা আমার দাঁড়িয়ে। ঐ—ঐ আমার মা, কাঞ্চনমালা।

দণ্ডধর ও পাটেশ্বরী ॥

কই, কই আমাদের বৌমা কই, বৌমা—বৌমা!

(কাঞ্চন শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করিল)

পাটেশ্বরী ॥

মা গো, পা ছুঁসনে! তুই যে আমার মদনমণির গলার—

দেবতার নির্মাল্য। আয় আয় বুকে আয়। বুক আমার জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে মা! (বক্ষে ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া) মা—মা—! আঃ!

(কাঞ্চন পাটেশ্বরীর গলা জড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজা দণ্ডধর দুই হাতে পাগলের মত কাঞ্চনমালার চুলে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কাঞ্চন উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার বাবাকে ইঙ্গিতে কি যেন বলিল)

দণ্ডধর ॥

বুঝেছি মা লক্ষ্মী, আসনের দরকার হবে না। দেব দেউলের এই অঙ্গনের চেয়ে কোন্ পবিত্র আসন তোর বাবা দেবেরে বেটি? (কাঞ্চন তাহার প্রায় অচৈতন্য শাশুড়ীর কোলের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। পাটেশ্বরী বুভুক্ষু দৃষ্টি দিয়ে তাহাকে দেখিতে লাগিল। মুখে কোন কথা নাই) আহা! মা যেন আমার মূর্তিমতী সন্ধ্যা! সন্ধ্যার মতই করুণ, স্নিগ্ধ, আনন্দমাখা। ও বেয়ান ঠাকরুণ, ওখানে গরু চোরের মত মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আমি যে দেখতেই পাই নি। নমস্কার! নমস্কার! বেয়াইও এখানে এসে বস না হে! কাঁদবার অনেক সময় আছে। হ্যাঁ, বুঝলেন বেয়ান ঠাকরুণ! আপনাদের একটু চমকে দেবার জন্যই না বলে কয়ে এসেছি এই সাধারণ নাগরিকের বেশে। আর এখন কি রাজ সমারোহ দেখাবার সময়? সোনার চাঁদ কুমার আমার কোথায় পথে পথে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরছে আর আমরা তার বাপ-মা আসব চতুর্দোলায় চড়ে? কি বল বেয়াই?

গৌড়েশ্বর ॥

আহা! মাকে আমার আজ কী সুন্দরই দেখাচ্ছে! সেই যে বিয়ের দিনে মা ঘোমটা দিয়েছিল তার পর মাথায় আর ঘোমটা ওঠে নি—দেখেছ বেয়াই?

পাটেশ্বরী ॥

পদসেবা করছে? আমার সোনার চাঁদ কুমারের বৌ আমার পদ-সেবা করছে? সে কি? ওরে—ওরে, তুই যে আমার বুকের মাণিক, গলার হার। আয় আয় আমার বুকে আয়। তুই যে আমার গোপালের গলার মালা। হ্যাঁ, আমার গোপালই ত, পুত্র হয়ে, মদনকুমার হয়ে আমার পেটে এসেছিল। তুই যে সেই গোপালের—আমার সেই নবীন গোরার নিবেদিতা মালা। কি বলছিলাম মা। গোপাল আমার এসেছিল। আমার ঘর ভরেছিল—বুক ভরেছিল, তার পর সব শূন্য ক'রে চলে গেল।

গৌড়ের রাণী ॥

বেয়ান! চলুন, আমার শোবার ঘরে শোবেন। কাঞ্চন! দেখছিস নে তোর শাশুড়ী কেমন করছেন। নিয়ে চল মা ওঁকে উপরে।

কাঞ্চনমালা ॥ (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে)

মা! (কিন্তু ইহার বেশী সে বলিতে পারিল না কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল)

পাটেশ্বরী ॥

ওরে ডাক—ডাক, আবার ডাক! সেই দস্যু কি তোর গলায় তার মা ডাকখানি রেখে গেছে; ডাক, আবার মা

বলে ডাক—আমার মন জুড়াক—প্রাণ জুড়াক—কান জুড়াক! ঠিক ঠিক এমনি ক'রে সে আমায় ডাকত—ঠিক তোর মতটি ক'রে আমার গলা জড়িয়ে। বেয়ান—দিদি। বৌমার চাঁদ মুখখানি যে ভাল ক'রে দেখতে পারছি নে। দেবালয়ের পঞ্চপ্রদীপ উজ্জ্বল ক'রে জ্বালিয়ে দাও। আমি দেখি কেমন ক'রে সেই নিষ্ঠুর এমন সোনার কমলকে চোখের জলে ভাসিয়ে গেল। (দেবালয়ের পঞ্চপ্রদীপের শান্ত উজ্জ্বল জ্যোতিতে দেব-দেউলের অঙ্গন ভরিয়া গেল। সেই আলোকে দেখা গেল শ্রীশ্যামসুন্দরের বিগ্রহ যেন রাণী পাটেশ্বরীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতেছে।) মন্দিরে ও কে। ও কে কাঁদে আমার পানে চেয়ে চেয়ে। ঐ—ঐ আমার গোপাল—আমার মদনকুমার—আমার দস্যু—চোর—ধর—ধর ওকে—ও আবার পালিয়ে যাবে—আবার পালিয়ে যাবে। (পাটেশ্বরী শ্যামসুন্দর বিগ্রহ বক্ষে জড়াইয়া দেব-দেউলের অঙ্গনে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন) ধরেছি। ধরেছি। তোরা সবাই ধর, ও পালিয়ে যেতে চায়—আবার পালিয়ে যেতে চায় দস্যু। চোর। গোপাল। আমার গোপাল।

[কাঞ্চনমালার শয়নকক্ষ। নিশুতি রাত্রি]

(গান করিতে করিতে কিন্তু সে গান নয়। ক্রন্দনও বুঝি অত করুণ হয় না। কাঞ্চনমালা তাহার রাজবেশ আভরণ খুলিতে লাগিল। স্তিমিত প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে সে যখন গৈরিক বসন পরিল তখন সহসা রাজভবনের আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই কাঞ্চনমালা চমকিয়া উঠিল। তাহার সখি অতসী দ্বারে তাহার

এই বেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কাঞ্চন অভিভূতের মত গাহিতে লাগিল)

গান

তুমি এতদিনে মরণ টানে টানলে বুকের কাছে
(ওগো বন্ধু পরাণ বন্ধু)
তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম
ত্রিভুবনে যত কিছু আমার প্রিয় আছে।
(ওগো বন্ধু পরাণ বন্ধু) ॥
আমার বসন আমার ভূষণ আমার কুল মান
আমার প্রেমের অহঙ্কার গো আমার অভিমান
তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম বন্ধু
(আজ) সকল দিয়ে বিনিময়ে তোমায় শুধু যাচে
দাসী তোমায় তোমায় শুধু যাচে
ওগো বন্ধু পরম বন্ধু ॥

অতসী ॥ (হাত ধরিয়া শান্ত কণ্ঠে)
এই অন্ধকার নিশীথে এই যোগিনীর বেশ প'রে কোথায় যাবি ?

কাঞ্চনমালা ॥
এ ত যোগিনীর বেশ নয় অতসী, এ বিয়োগিনীর সাজ। তাঁর সাথে যোগ আমার কখন হ'ল যে যোগিনীর সাজ পরব ?

অতসী ॥
যোগ বিয়োগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম কাঞ্চনমালা।

কাঞ্চনমালা ॥ (চমকিয়া উঠিয়া)

ঠিক এমনি করুণ কণ্ঠে সে বিয়ের রাতে আমায় ডেকেছিল। নিজের চিরদিনের শোনা নামও যে নিজের কানে এমন মিষ্টি শোনায় সেইদিন প্রথম বুঝলুম।

অতসী ॥

তুই তারই অভিসারে চলেছিস নাকি ?

কাঞ্চনমালা ॥

একে অভিসারই বা বলি কি ক'রে সই ? শ্রীরাধাকে তাঁর সুন্দর দেবতা অভিসারের ইঙ্গিত করেছিলেন—আমি ত আমার দেবতার কোনো ইঙ্গিত পাই নি !

অতসী ॥

তাহলে তুই কোন্ আশায় কোথায় যাবি ?

কাঞ্চনমালা ॥

আশা নেই বলেই ত যাচ্ছি। আশা থাকলে বসে থাকতুম পথের দিকে চেয়ে। আশা থাকলে পথই তাঁকে বয়ে এনে দিত আমার বুকে। যে ফুলের আশা আছে সে দেবতার পূজোয় লাগবে। সেই ফুলই বনের ডালায় ফুটে থাকে—কিন্তু স্রোতের ফুলের আশা কোথায় ? স্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া তার ত আর কোনো গতি নেই সই !

অতসী ॥

এ সব হেঁয়ালি রাখ দেখি। তুই তাঁকে পথে পথে খুঁজে বেড়াবি এই ত ?

কাঞ্চনমালা ॥

আর আমি তাঁকে খুঁজব না। আগে খুঁজব তাঁর পথ।

পথ যদি পাই—পথের শেষে তাঁকেও পাব। শোন অতসী, ঐ দেখ আমার ফুল-সাজ সব খুলে রেখেছি। আমার শাশুড়ী জোর ক'রে কাল এসব পরিয়েছিলেন। বিয়ের রাতে এমনি ফুলের সাজে সেজেছিলুম। কালও পরেছিলুম, ঐ আমার শেষ পরা। পরতে কি ইচ্ছা করছিল। মন্দিরে বিগ্রহ নেই অথচ নিবেদনের থালা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। যেমন অকারণ তেমনি করুণ।

অতসী ॥

আমি কিন্তু এখনই কেঁদে চেঁচিয়ে বাড়িসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে দেবো।

কাঞ্চনমালা ॥ (হাসিয়া)

কাউকে জাগাতে পারবি নে—আমাকে ফেরাতে পারবি নে। সীতা যেদিন বনে গেছলেন তাঁকে কি তাঁর বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ী ফেরাতে পেরেছিলেন।

অতসী ॥

কিন্তু সেদিন ত শ্রীরামচন্দ্র সীতার সাথে ছিলেন। তোর সাথী কে?

কাঞ্চনমালা ॥ (হাতের নোয়া দেখাইয়া)

আমার শ্রীরামচন্দ্রও আমার সাথে আছেন। (কপালে নোয়া ঠেকাইয়া) এই এয়োতির নোয়া যদি আমার হাতে থাকে অতসী—আমার কোনো পথকে—কোনো বনকে কোনো বারণকে ভয় নেই!

(বলিয়া অন্ধকারে পথের মাঝে হারাইয়া গেল)

অতসী ॥

কাঞ্চন! কাঞ্চনমালা! এই অন্ধকারে কে তোকে পথ দেখাবে ?

(দূর হতে প্রবল কণ্ঠের আওয়াজ আসিল)

"আমার প্রেম !"

[সন্দ্বীপ—নিশুতি রাত্রি। আকাশের চাঁদ সাগরের জলে খেলা করিতেছে। মধুমালা নিদ্রা-নিমগ্না]

দূরাগত ঘুমপরী ও স্বপনপরীর গান

সাগর জলে খেলতে এল তোর আকাশের চাঁদ।
এবার যেন পালিয়ে না যায় বাঁধলো ওরে বাঁধ ॥
ঘুমাস্ নে লো ঘুমাস্ নে আর
চোর এল ঐ ভাঙলো দুয়ার
(এখন) চোরকে বেঁধে বাহুর ডোরে পরাণ ভরে কাঁদ ॥

মধুমালা ॥ (জাগিয়া উঠিয়া)

কে ? তোমরা কে ?

ঘুমপরী ॥

তোমার সতীন।

স্বপনপরী ॥

একজন নয় এক জোড়া।

মধুমালা ॥

এ তোমরা কি বলছ ? তোমরা কে, তোমাদের ত এখানে কখনও দেখি নি। (চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া হাসিয়া)

ও। আমি স্বপ্ন দেখছি, না আমি কি বোকা! (চোখ মেলিয়া) তা, তোমাদের সতীন করতে রাজী আছি—যদি আমার পতিকে ফিরে পাই। (চোখ বুজিয়া) যাক, মিথ্যে হোক, তবুও স্বপ্নে তাকে একবার দেখতে পাব।

ঘুমপরী ॥

কি ভাবছ চোখ বুজে? চোখ মেলে দেখ তোমার পাশে কে। (চমকিয়া উঠিয়া) এঁ্যা, তুমি? কুমার? তুমি? চীৎকার ক'রে বাবাকে মা'কে ডাকব নাকি? না না, চেঁচালেই ঘুম ভেঙে যাবে, স্বপ্ন যাবে টুটে, আর তুমি যাবে চলে। ওগো, তুমি জাগো, আমি কাউকে ডাকবো না। (ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে) আমি কাঁদব না—জেগে একটিবার একটি শুধু কথা বলে ঘুমোও—আমি আর কিছু বলব না। কিচ্ছু চাইব না। শুধু চেয়ে দেখব। (ঘুমপরী ও স্বপনপরীর দিকে চাহিয়া) তোমরা কে জানি না। তোমরা যেই হও একটু বস না আমার বিছানায়। না না, তোমরা যে সতীন, আমার বিছানায় বসবে কেন? না হয় ওঁর বিছানাতেই বস। তোমরাই ওঁকে ঘিরে বস। আমি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দেখব।

স্বপনপরী ॥

তোমার স্বামী যদি সত্যই জাগেন, তাহলে কি আমাদের এখানে থাকতে দেবে? সত্যি ক'রে বল।

মধুমালা ॥

সত্যি ক'রে বলছি—এই তোমাদের গা ছুঁয়ে বলছি—একি! তোমাদের গায়ে হাত দিতে মনে হ'ল যেন তোমরা

ছায়া—তোমাদের দেহ নেই—শুধু রূপ—তোমরা যেন চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া।

স্বপনপরী ॥

এইবার রাজপুত্র জাগবে আমরা যাই। এই শিকারীকে আর ছেড়ো না কিন্তু। এতদিন আমরা আগলে রেখে-ছিলুম। এবার তোমার গলার হার তোমাকে দিলুম। আমার নাম স্বপনপরী—ওর নাম ঘুমপরী। (বলিতে বলিতে যেন হাওয়ায় তাহারা মিলিয়া গেল। তাহাদের অশরীরী গান মধুমালার স্বর্ণপুরীকে কাঁদাইয়া তুলিল)

গান

বন্ধু বিদায়—!
যাই চলে যাই—তোমার গলার মালা পরায়ে তোমায় ॥
ফুল ঝরে যে পথে হারায়—
অশ্রু ঝরে যে পথে লুকায়
যাই যাই—
যে আঁধার পথে আশার বাতি নিভে যায়।
বন্ধু বিদায় ॥

(সহসা বাহিরে প্রহরীদের কোলাহল শোনা গেল। পিঞ্জরের শুকসারী—বনের পাখী ডাকিয়া উঠিল সচকিত স্বরে। "কে গো" "কে গো" বলিয়া ভাব-শিখী ডাকিয়া উঠিল।)

মদনকুমার ॥

আবার, আবার শুনি সেই সাগরের ক্রন্দন। (চক্ষু মুছিয়া) কে? মধুমালা! মধুমালা!

(মধুমালা "কুমার" "কুমার" রাজপুত্রের বুকে লুটাইয়া পড়িল)

মধুমালার গান

আমার পায়ের বেড়ী
　　　　এই সোনার পুরী ভেঙে
যাওগো নিয়ে তোমার দেশে
　　　　পাব সেথায় জেগে
তোমায় পাব সেথায় জেগে ॥
　　　　এই যে সাগর এই যে কুমার
এই যে তোমার আমি,
　　　　এই যে তুমি স্বপ্নে-পাওয়া মধুমালার স্বামী,
(এবার) তোমার হাসির রঙে আঁধার পুরী উঠুক রেঙে ॥

রাণী তিলোত্তমা ॥

কি হয়েছে মা মধুমালা? আজ সকালে এত আনন্দের গান কেন? (মদনকুমারকে দেখিয়া) কে, কে ঐ সুন্দর চাঁদ? ওরে পূর্ণিমার চাঁদ কি আজ সাগর-জলে নেয়ে মালার ঘরে এসে উঠল? দাস-দাসী, প্রহরী কে কোথায় আছিস ছুটে যা—মহারাজকে খবর দে! সারা রাজ্যে খবর দে। মধুমালার বর ফিরে এসেছে। ওলো, তোরা উলু দে, শঙ্খধ্বনি কর—বরণ-ডালা আন। (দাসদাসী সব উলুধ্বনি দিতে দিতে—শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল।)

সকলের গান

নিশির পাহারা ভেঙে চোর এসেছে ঘর
ধরতে গিয়ে দেখি ওলো চোর নয় সে বর।
　　　　বর এসেছে বর এসেছে বর এসেছে বর ॥

এ পালিয়েছিল চুরি ক'রে মোদের সখির নিদ্,
(এই) হৃদয়-বনের শিকারীকে নয়ন দিয়ে বিঁধ।
এ যে, ফুলের মালায় বন্দী ক'রে পরাল টোপর॥
বর এসেছে বর এসেছে বর এসেছে বর॥

(মদনকুমার ও মধুমালাকে ঘেরিয়া উদ্দাম নৃত্যগীতের উৎসব চলিয়াছে। সোনার সিংহাসনে বসিয়া বরবধূর বেশে মধুমালাও মদনকুমার)

নর্তকীদের গান

অনেক জ্বালা দিয়েছ তার শাস্তি পাবে কালা।
বেঁধেছি তাই গলায় তোমার জড়িয়ে মধুমালা॥
আজ গায়ে পড়ে সাধতে হবে
পায়ে ধরে কাঁদতে হবে
শাপ্‌লা মধু পানের আগে
দেখব বঁধু কেমন লাগে বাব্‌লা জ্বালা॥

রাণী তিলোত্তমা॥

ওরে! তোরা আর ওদের বেশী রাত জাগাসনে। এবার ওদের শুতে দে। দেখছিস্ না আমার সোনার চাঁদের মুখখানি যেন রোদের তাতে থল কমলের মত রাঙিয়ে গেছে। লক্ষ্মী মেয়েরা আমার, এবার ওদের শুতে দে।

মেয়েরা॥

বেশ রাণীমা, আমরা যাচ্ছি কিন্তু কাল রাত্রে সুদে আসলে সব আদায় করব বলে দিচ্ছি। (যাইতে যাইতে) চোরের শাস্তি কিন্তু হ'ল না মধুমালা। ভাল ক'রে আগলাস আবার যেন না পালায়। পায়ে টেকো বেঁধে দিস—চোরা গরুকে বিশ্বাস নেই।

(সাগরতীরে কাঞ্চনমালার করুণ সংগীত-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। মধুমালা ও মদনকুমার উৎকর্ণ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল)

কাঞ্চনমালার গান

ওগো বন্ধু! দাও সাড়া দাও এই কি পথের শেষ?
এই কি তোমার স্বপ্নে দেখা মধুমালার দেশ?

মধুমালা ॥

ওগো। কে এমন কেঁদে কেঁদে আমার নাম ধরে গান করছে? ওকি, তুমি অমন উতলা হচ্ছ কেন? চল, চল আমার সাথে। ঐ খিড়কির দুয়ার দিয়ে সাগরতীরে গিয়ে দেখি ওকে। তোমার পায়ে পড়ি, চল না। ওর গান শুনে আমার বুকে এমন কান্নার জোয়ার এল কেন? চল চল।

(মদনকুমার ও মধুমালা নীরবে দাসদাসী প্রভৃতির চোখ এড়াইয়া খিড়কি-দ্বার দিয়া সাগরতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, এক-বুক সাগর-জলে দাঁড়াইয়া গৈরিক বেশধারিণী এক সন্ন্যাসিনী। তাহার রূপের জ্যোতিতে আর গৈরিক বসনের আভায় চারপাশের সাগর জল গেরুয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সে ইহাদের পানে চাহিয়াও দেখিল না। নয়ন মুদিয়া সে যেন মহাসাগরের গান শুনিতেছে। মদনকুমার ও মধুমালা ছায়ামূর্তির মত দাঁড়াইয়া সেই গান শুনিতে লাগিল)

গান

ওগো বন্ধু। দাও সাড়া দাও এই কি পথের শেষ?
এই কি তোমার স্বপ্নে-দেখা মধুমালার দেশ?
মহাসাগর! সাক্ষী থেকো! আমার কথা বলো
তার বিবাহের লগ্নে আমার যাবার সময় হ'ল।

সে তার পথ পেল যখন পথ হারালাম আমি তখন
যে আমায় আনল পথে সে আজ নিরুদ্দেশ ॥
তোমার শীতল জলে
তোমার অতল তলে
জুড়াও ওগো জুড়াও আমার সকল ক্লেশ ॥

মধুমালা ॥

কে? কে তুমি যোগিনী? মহাসাগরের বুকে এমন রোদনের জোয়ার আনলে? (সন্ন্যাসিনী যেন ধ্যান-রতা)

মদনকুমার ॥

ডেকো না মধুমালা, ওকে ডেকো না। মহাসাগর যাকে ডাক দিয়েছে, তীরের ক্ষুদ্র মানুষ তাকে ডেকে সাড়া পাব না মধুমালা।

মধুমালা ॥

তুমি অমন উতলা হয়ে উঠছ কেন। তোমার চোখে জল কেন। তুমি কি তাহলে ওঁকে চেন। তবে কি—তবে কি ইনিই সেই দেবী যার আসার কথা ঘুমপরী বলেছেন। যাঁর সাথে তোমার অপরূপ বিবাহের কথা বলেছিলে। উনিই—ঐ দেবীই কি তাহলে আমার দিদি। (চীৎকার করিয়া জলে নামিতে নামিতে) দিদি। দিদি। আমি—আমি মধুমালা, তোমার ছোট বোন—তোমাকে নিতে এসেছি। তোমার সাগর জলের চাঁদ ঐ—ঐ কূলে দাঁড়িয়ে তোমার স্তব শুনছেন। যেয়ো না—যেয়ো না—আমায় প্রণাম করার অবকাশ দাও। (কাঞ্চনমালা উঠিয়া আসিয়া মধুমালাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন)

কাঞ্চনমালা ॥

চল্ তীরে উঠি। যে তীর্থ দেবতার দর্শনের আশায় এই পথের শেষে এসে পৌঁছলুম, তাঁকে প্রণাম না ক'রে গেলে যে আমার জলে স্নান করার আনন্দ হবে না। সত্যি, কি সুন্দর তুই মধুমালা। আমারই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করছে— ও ত পুরুষমানুষ। তোকে দেখে আমার আজ আর কোনো দুঃখ রইল না মধু (কাঞ্চনমালা মধুমালার মুখচুম্বন করিলেন)।

মধুমালা ॥ (হেসে)

আমি সন্তুষ্ট হলাম, তুমি আমার মুখে চুম্বন করলে। আর কি ভাবনার আছে। আজ থেকে তোমায় দিদি বলে ডাকব।

কাঞ্চনমালা ॥

ও কথা তুই কেন মনে করলি মধুমালা। অর্জুনের মত স্বামী পেয়েছিলেন বলেই দ্রৌপদী সুভদ্রাকে বরণ ক'রে ঘরে তুলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মত পতি পেয়েছিলেন বলেই রুক্মিনী তাঁর পতিকে পরিপূর্ণ চিত্তে সত্যভামার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মধুমালা ॥

তাহলে তেমনি ক'রে—তেমনি ক'রে তুমি আমায় বরণ ক'রে তুলে তোমার পায়ের দাসী ক'রে রাখ না দিদি।

কাঞ্চনমালা ॥

যদি ঘর আমাকে আশ্রয় দিত তাহলে তাই করতাম মধুমালা। আর ভাল হয়ত তোর স্বামীর চেয়েও বাসতাম।

মধুমালা ॥

এখনও তোমার ওঁর উপরে অভিমান যায় নি দিদি। নইলে

"আমার স্বামী" না বলে "তোর স্বামী" বললে কেন।

কাঞ্চনমালা ॥

কার উপরে অভিমান করব মালা। আমি কি ওকে একটু কালের দেখা ছাড়া কখনও দেখেছি যে অভিমান করব। উনি কি আমায় কোনোদিন সে অধিকার দিয়েছেন। তবু সে কি আকর্ষণ, মধু, তা তুই হয়ত বুঝবি নে। সাগর কত জোরে টানলে সে নদী পাহাড় জঙ্গল ভেঙে তার বুকে ছুটে আসে তা নদী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

মধুমালা ॥

দিদি একটু কূলে ওঠ না, আমি যে তোমার পায়ের ধুলো নিতে পারছি নে।

কাঞ্চনমালা ॥

কূলেই ত বসেছিলুম বহুদিন বহুবর্ষ। সেখানে যখন তাকে দেখলাম না তখনই ত অকূলের পথে পাড়ি দিলুম বোন। বাঙালীর মেয়ে যত সাধু উদ্দেশ্যই বুকে ক'রে একবার কুলের বাইরে পা বাড়াক না আর কি সে কুলে ফিরে যেতে পারে?

মধুমালা ॥

কিন্তু কূলে ত তোমায় উঠতেই হবে—তাঁকে প্রণাম করতে, তখন যদি আমি ছেড়ে না দিই?

কাঞ্চনমালা ॥

যে নদী সকল পথের বাধা ডিঙিয়ে সাগরে মিলতে এল তাকে মিলন মোহনার মুখে আটকাবি মনে করিস? তুই বড্ডো ছেলেমানুষ। আহা। মুখখানা কি কাঁচা।

মধুমালা ॥

আর তোমার মুখ বুঝি কাঁচা নয়? তোমার কথাগুলোই যা পাকা আর সব কাঁচা! দিদি! তোমাকে এই অবস্থায় চাঁদের আলোতে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র মন্থনের শেষে লক্ষ্মীদেবী সাগর সিনান ক'রে উঠছেন!

কাঞ্চনমালা ॥

কিন্তু তিনি উঠেছিলেন অমৃত নিয়ে। আর আমি উঠেছি বেদনার সিন্ধু মন্থনের শেষে অশ্রু লক্ষ্মীরূপে। তাই ত তোদের অমৃতের সংসারকে লবণাক্ত করতে চাইনে! দেরি হয়ে গেল মালা। ওঁকে একবার এই জলের দিকে পা বাড়িয়ে দিতে বলবি।

মদনকুমার ॥

কাঞ্চন! কাঞ্চনমালা! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! আমি আর সইতে পারছি নে। আমি যে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি তুমি এই সুদূর পথ এমন ক'রে একা অতিক্রম করতে পারবে।

কাঞ্চনমালা ॥

তুমি মধুমালাকে স্বপ্নে দেখে যদি এই দূর পথ অতিক্রম করতে পার আর আমি আমার স্বামীকে বরণ-ডালার পঞ্চ-প্রদীপের আলোক-শিখায় দেখে সেই পথ পার হতে পারব না?

মদনকুমার ॥

কিন্তু আমি—আমি তোমার কে কাঞ্চন? আমি—আমি ত স্বামিত্বের অভিনয় করেছিলুম—বরবেশে এসেছিলুম!

কাঞ্চনমালা ॥

স্ত্রীর স্বামী বর সেজেই আসেন। তুমি আমার কে তাই জিজ্ঞাসা করছিলে না ? শোন, এই মহাসাগরে শুয়ে থাকেন যে পাষাণের নারায়ণ—সেই নারায়ণ শিলাকে সাক্ষী ক'রে বিবাহের দিন যা বলেছিলাম আজও আবার তাই বলছি। তুমিই আমার স্বামী আমার ইহলোক পরলোক জনম জনমের গতি—পরম পতি—আমার ধ্যান জ্ঞান তপস্যা, তোমাকেই ধ্রুবতারা ক'রে এই মহাসাগরের মিলন মোহনায় বিনা বাধায় এসে পৌঁছেছি। (মধুমালার দিকে ফিরিয়া) লক্ষ্মী-নারায়ণকে একসঙ্গে দেখলাম। সত্যি মালা, তোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাগর মন্থনের শেষের লক্ষ্মীশ্রী।

মধুমালা ॥ (তাহার চোখে মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যাইতেছিল)

লক্ষ্মী উঠেছিলেন অমৃত নিয়ে বেদনায় সিন্ধু-মন্থনের শেষে আমি উঠেছি অশ্রুলক্ষ্মী রূপে। দিদি, তোমাদের অমৃতের সংসারকে আমি লবণাক্ত করতে চাইনে। (সাগর-জলে ঝম্প প্রদান)।

কাঞ্চনমালা ॥

মালা ! এ কি করলি তুই ?

মধুমালা ॥ (আর্তকণ্ঠে)

হে আমার চির জনমের স্বামী—প্রণাম ! প্রণাম !!

কাঞ্চনমালা ॥

মালা—মালা—মধুমালা—

যবনিকা